চারু ও কারুকলা

অষ্টম শ্রেণি

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ২০১৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে
অষ্টম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত

চারু ও কারুকলা

অষ্টম শ্রেণি

২০২৫ শিক্ষাবর্ষের জন্য পরিমার্জিত

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০

কর্তৃক প্রকাশিত

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

প্রথম সংস্করণ রচনা ও সম্পাদনা

মুস্তাফা মনোয়ার

হাশেম খান

এডলিন মালাকার

এ. এস. এম. আতিকুল ইসলাম

সনজীব দাস

প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর, ২০১২

পরিমার্জিত সংস্করণ : সেপ্টেম্বর, ২০১৪

পরিমার্জিত সংস্করণ : অক্টোবর, ২০২৪

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে :

প্রসঙ্গ কথা

বর্তমানে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার উপযোগ বহুমাত্রিক। শুধু জ্ঞান পরিবেশন নয়, দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলার মাধ্যমে সমৃদ্ধ জাতিগঠন এই শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য। একই সাথে মানবিক ও বিজ্ঞানমনস্ক সমাজগঠন নিশ্চিত করার প্রধান অবলম্বনও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা। বর্তমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিনির্ভর বিশ্বে জাতি হিসেবে মাথা তুলে দাঁড়াতে হলে আমাদের মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। এর পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের দেশপ্রেম, মূল্যবোধ ও নৈতিকতার শক্তিতে উজ্জীবিত করে তোলাও জরুরি।

শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড আর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার প্রাণ শিক্ষাক্রম। আর শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ হলো পাঠ্যবই। জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এর উদ্দেশ্যসমূহ সামনে রেখে গৃহীত হয়েছে একটি লক্ষ্যাভিসারী শিক্ষাক্রম। এর আলোকে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) মানসম্পন্ন পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন, মুদ্রণ ও বিতরণের কাজটি নিষ্ঠার সাথে করে যাচ্ছে। সময়ের চাহিদা ও বাস্তবতার আলোকে শিক্ষাক্রম, পাঠ্যপুস্তক ও মূল্যায়নপদ্ধতির পরিবর্তন, পরিমার্জন ও পরিশোধনের কাজটিও এই প্রতিষ্ঠান করে থাকে।

বাংলাদেশের শিক্ষার স্তরবিন্যাসে মাধ্যমিক স্তরটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বইটি এই স্তরের শিক্ষার্থীদের বয়স, মানসপ্রবণতা ও কৌতূহলের সাথে সংগতিপূর্ণ এবং একইসাথে শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের সহায়ক। বিষয়জ্ঞানে সমৃদ্ধ শিক্ষক ও বিশেষজ্ঞগণ বইটি রচনা ও সম্পাদনা করেছেন। আশা করি বইটি বিষয়ভিত্তিক জ্ঞান পরিবেশনের পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের মনন ও সৃজনের বিকাশে বিশেষ ভূমিকা রাখবে।

চারু ও কারুকলা শিক্ষা শিক্ষার্থীর মধ্যে প্রকৃতি, পরিবেশ, জীবন ও জীবনধারা ইত্যাদি সম্পর্কে পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। এ শিক্ষা অন্যান্য বিষয়ে শিক্ষাগ্রহণে যেমন, সাধারণ বিজ্ঞান, ভূগোল, চিকিৎসা বিজ্ঞান, প্রকৌশল বিজ্ঞান, স্থাপত্যকলা ইত্যাদি বিষয়ের প্রয়োগিক জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনেও সহায়তা করে। এ শিল্পশিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর মধ্যে শৃঙ্খলাবোধ, পরিমিতিবোধ, সৌন্দর্যবোধ, দেশপ্রেম ও মানবিক মূল্যবোধের বিকাশ ঘটে এবং তারা হয়ে ওঠে সৃজনশীল।

পাঠ্যবই যাতে জবরদস্তিমূলক ও ক্লান্তিকর অনুষঙ্গ না হয়ে উঠে বরং আনন্দাশ্রয়ী হয়ে ওঠে, বইটি রচনার সময় সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা হয়েছে। সর্বশেষ তথ্য-উপাত্ত সহযোগে বিষয়বস্তু উপস্থাপন করা হয়েছে। চেষ্টা করা হয়েছে বইটিকে যথাসম্ভব দুর্বোধ্যতামুক্ত ও সাবলীল ভাষায় লিখতে। ২০২৪ সালের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে প্রয়োজনের নিরিখে পাঠ্যপুস্তকসমূহ পরিমার্জন করা হয়েছে। এক্ষেত্রে ২০১২ সালের শিক্ষাক্রম অনুযায়ী প্রণীত পাঠ্যপুস্তকের সর্বশেষ সংস্করণকে ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। বানানের ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমির প্রমিত বানানরীতি অনুসৃত হয়েছে। যথাযথ সতর্কতা অবলম্বনের পরেও তথ্য-উপাত্ত ও ভাষাগত কিছু ভুলত্রুটি থেকে যাওয়া অসম্ভব নয়। পরবর্তী সংস্করণে বইটিকে যথাসম্ভব ত্রুটিমুক্ত করার আন্তরিক প্রয়াস থাকবে। এই বইয়ের মানোন্নয়নে যে কোনো ধরনের যৌক্তিক পরামর্শ কৃতজ্ঞতার সাথে গৃহীত হবে।

পরিশেষে বইটি রচনা, সম্পাদনা ও অলংকরণে যাঁরা অবদান রেখেছেন তাঁদের সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই।

অক্টোবর ২০২৪

প্রফেসর ড. এ কে এম রিয়াজুল হাসান

চেয়ারম্যান

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

সূচিপত্র

অধ্যায়	শিরোনাম	পৃষ্ঠা
প্রথম	বাংলাদেশের প্রাচীন শিল্পকলা ও ঐতিহ্যের পরিচয়	১–৫
দ্বিতীয়	বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে চারুশিল্প ও শিল্পীরা	৬–১৪
তৃতীয়	বিখ্যাত শিল্পী ও শিল্পকর্ম	১৫–২৩
চতুর্থ	শিল্পকলা	২৪–২৯
পঞ্চম	ছবি আঁকার বিভিন্ন মাধ্যম ও উপকরণ	৩০–৩৩
ষষ্ঠ	বিষয়ভিত্তিক ছবি ও নকশা অঙ্কন	৩৪–৩৮
সপ্তম	বিভিন্ন মাধ্যমের শিল্পকর্ম	৩৯–৬০
পরিশিষ্ট	রং ও রঙিন ছবি	৬১–৬৮

প্রথম অধ্যায়

বাংলাদেশের প্রাচীন শিল্পকলা ও ঐতিহ্যের পরিচয়

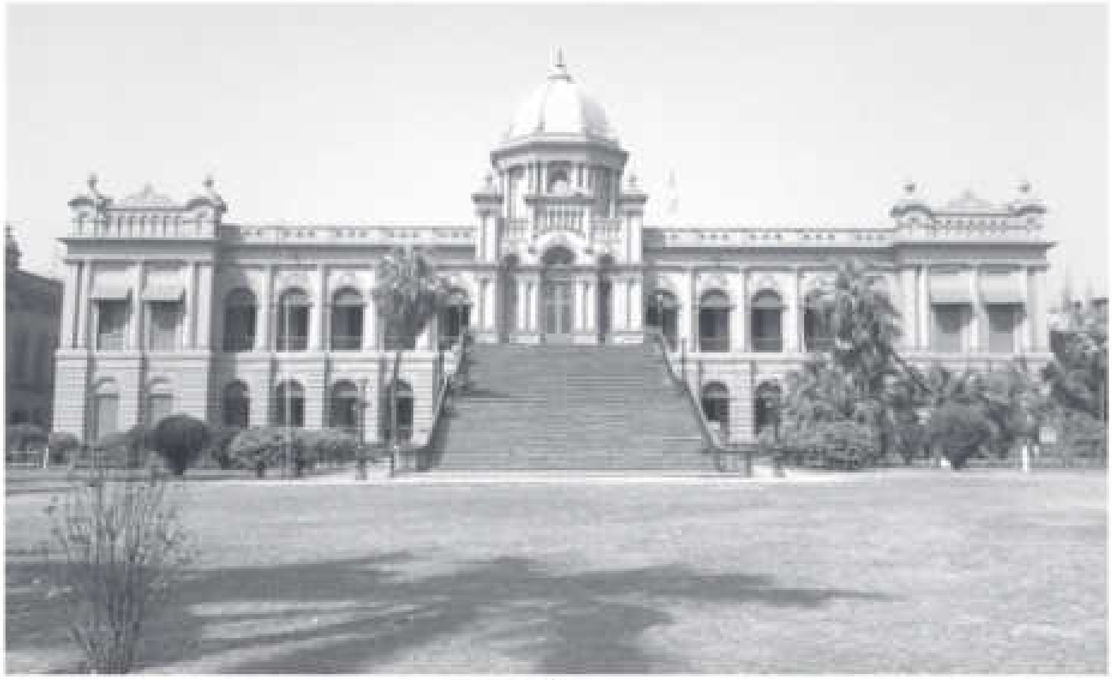

আহসান মঞ্জিল, ঢাকা

এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা–

- বাংলাদেশের প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী শিল্পকলা ও দর্শনীয় স্থানগুলোর বর্ণনা দিতে পারব।
- প্রাচীন শিল্পকলার নির্মাণশৈলীর বর্ণনা দিতে পারব।
- জীবন ও জীবিকার জন্য চারু ও কারুকলা শিক্ষার গুরুত্ব উল্লেখ করতে পারব।
- চারু ও কারুকলার ব্যবহারিক ক্ষেত্রগুলো চিহ্নিত করতে পারব।
- কালের বিবর্তনে টিকে যাওয়া শিল্পকর্মগুলোর নাম বলতে পারব।

পাঠ : ১ ও ২

বাংলাদেশের প্রাচীন শিল্পকলার পরিচয়

বাংলাদেশ নামক অঞ্চলের সবচেয়ে পুরোনো ছবি কী? ভাস্কর্য কী? স্থাপত্য ও অন্যান্য শিল্পকলা কোথায় গেলে দেখা যাবে? এমন কিছু প্রশ্নের সহজ জবাবে বলা যায়, একসঙ্গে এই পুরোনো শিল্পকলার কিছু পরিচয় পাওয়া যাবে ঢাকায় অবস্থিত জাতীয় জাদুঘরের সংগ্রহশালায়, রাজশাহীর বরেন্দ্র জাদুঘরে, বগুড়ার মহাস্থানগড়ে, কুমিল্লার ময়নামতি ও রাজশাহীর পাহাড়পুর জাদুঘরে। ভৌগোলিক কারণে বাংলাদেশের বেশিরভাগ অঞ্চল পলিমাটির অঞ্চল। জলাভূমি ছোটো-বড়ো অসংখ্য নদী ও খাল দ্বারা বেষ্টিত এ ভূখণ্ড। ঝড়বৃষ্টি ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ সব সময় যেন লেগেই আছে। ঐতিহাসিকভাবে যারা এখানে বসবাস করত তারা বেশিরভাগই ছিল সাধারণ চাষি, মজুর ও গরিব। রাজা-বাদশাহ ও শাসকদের মহলে তখন ছবি আঁকা ও অন্যান্য শিল্পকর্মের চর্চা ছিল। একমাত্র তাঁদের মহল ও বাড়ি-ঘর ইটের দেয়াল, পাথরের শক্ত খিলানে তৈরি হতো। সাধারণ বাড়িঘর ছিল ছনের, মাটির, বাঁশের ও খড়ের।

খ্রিস্টের জন্মের আগে বেশ কিছুকাল এই অঞ্চল শাসন করেছে মৌর্য বংশের রাজারা। এই বংশের শক্তিশালী রাজা ছিলেন সম্রাট অশোক। খ্রিষ্টীয় চার শতক থেকে কয়েকশো বছর রাজত্ব করেন গুপ্ত বংশের রাজারা। গুপ্তযুগের বিখ্যাত রাজাদের নাম সমুদ্রগুপ্ত, কুমারগুপ্ত, বৈন্যগুপ্ত প্রমুখ। এরপর কয়েকশো বছর রাজত্ব করেন পালবংশের রাজারা। তাঁদের আমলের যেসব শক্তিশালী রাজার নাম পাওয়া যায় তাঁরা হলেন গোপাল, ধর্মপাল, দেবপাল, মহীপাল, রামপাল প্রমুখ।

তারপর আসে বর্মণ ও সেন বংশীয় রাজারা। সে-সময় গোটা বাংলাভূমি দুই ভাগে বিভক্ত ছিল। উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের নাম ছিল গৌড়রাজ্য। দক্ষিণ-পূর্বভাগের নাম ছিল সমতট।

১২০৪ খ্রিষ্টাব্দে বখতিয়ার খিলজি রাজা লক্ষ্মণ সেনের কাছ থেকে এই বাংলা অঞ্চল ছিনিয়ে নিয়ে রাজত্ব শুরু করেন। তিনি ছিলেন জাতিতে তুর্কি। এরপর মুঘল সম্রাট আকবরের আমল পর্যন্ত কয়েকশো বছর চলে মুসলিম সুলতানদের রাজত্বকাল। এ-সময়ের নাম সুলতানি আমল। এই সময়ের উল্লেখযোগ্য সুলতান ছিলেন ফখরুদ্দিন মোবারক শাহ্, শামসউদ্দিন ইলিয়াস শাহ্, সেকান্দর শাহ্, গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ্, জালালউদ্দিন মোহাম্মদ শাহ্, আলাউদ্দিন হোসেন শাহ্, গিয়াসউদ্দিন মাহমুদ শাহ্ প্রমুখ। এরপর বাংলা শাসন করেন মুঘলরা, মাঝে মাঝে কোনো স্বাধীন নৃপতি। তারপর শেষ স্বাধীন নৃপতি সিরাজ-উদ্-দৌলাকে সিংহাসনচ্যুত ও হত্যা করে বাংলায় ইংরেজ শাসন কায়েম হয়। দুইশত বছর ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসনের পর ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান ও ভারত নামে ২টি দেশ স্বাধীন হয়। পাকিস্তানের দুই অংশ। পূর্ব-পাকিস্তান ও পশ্চিম-পাকিস্তান। ১৯৭১ সালে আমরা পশ্চিম পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ করে পূর্ব-পাকিস্তানকে মুক্ত করে বর্তমান বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করি।

গত কয়েক হাজার বছর ধরে বাংলা অঞ্চল কখনো গোটা অঞ্চল, কখনো-বা ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলে বিভক্ত হয়ে ভিন্ন ভিন্ন রাজা ও শাসকদের দ্বারা শাসিত হয়েছে। এক অঞ্চলের সাথে অন্য অঞ্চলের রেষারেষি ও যুদ্ধবিগ্রহ সব সময় লেগেই ছিল। পরাজিত অঞ্চল লুট করা, জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে দেয়া ধ্বংস করে দেয়া এসব স্বাভাবিক ব্যাপার ছিল। তাই কোনো কোনো অঞ্চল বিরান অর্থাৎ মানবশূন্য হয়ে যেত। দীর্ঘকাল বিরান থেকে একসময় মাটিচাপা পড়ে যেত। ঝড়ঝঞ্ঝা ও ভূমিকম্পের কারণেও এরকম মাটিচাপা পড়ে যেত। বাংলাদেশে মাটির স্তূপ ও গড় অঞ্চল খনন করে এরূপ কয়েকটি জনপদের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে। এগুলো হলো রাজশাহী অঞ্চলের পাহাড়পুর, কুমিল্লার ময়নামতি, বগুড়ার মহাস্থানগড়, নরসিংদী জেলার ওয়ারী বটেশ্বর এর প্রাচীন সভ্যতা এবং সর্বশেষ আবিষ্কৃত মুন্সিগঞ্জ জেলার টংগীবাড়ী উপজেলার নাটেশ্বর সভ্যতা।

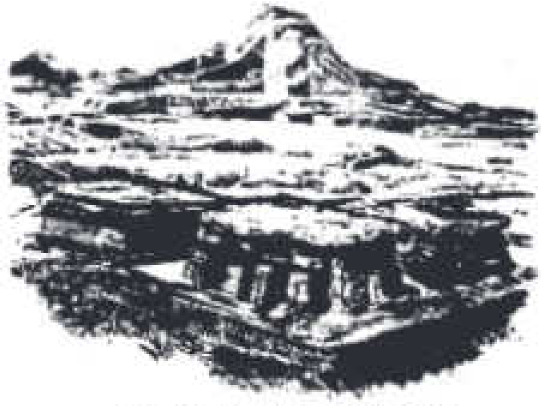

রাজশাহী অঞ্চলে পাহাড়পুর বৌদ্ধবিহার

দীর্ঘদিন মাটিচাপা থেকে অনেক কিছুই ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। পাওয়া গিয়েছে কিছু লোহা ও তামার হাতিয়ার, হাঁড়ি-পাতিল, মূর্তি, পোড়ামাটির ভগ্নপাত্র, ফলকচিত্র, পাথরের মূর্তি, পাথরের ফলকচিত্র, শিলালিপি বা পাথরে উৎকীর্ণ লেখা, ফরমান, খিলান, স্তম্ভ, পিলার, ভগ্নদশায় ভবন ও ঘরবাড়ির কাঠামো, সে-সময়ে ব্যবহৃত মুদ্রা ও অলংকার। আর এসব বস্তুই বাংলা অঞ্চলের প্রাচীন শিল্পকলা ও স্থাপত্যের নিদর্শন। ধ্বংসপ্রাপ্ত ভবন ও বাড়িঘরের খিলান, স্তম্ভ, দেয়াল, ভিত্তি ও কাঠামো থেকে আমরা প্রাচীন স্থাপত্যের নিদর্শন বুঝে নিতে পারি। চিত্রকলা ও নরম উপাদানে তৈরি কোনো শিল্পকর্ম এতদিন মাটির নিচে ও ঝড়ঝঞ্ঝায় সংরক্ষিত থাকার কোনো উপায় নেই। রক্ষা পেয়েছে ক্ষয়ে-যাওয়া লোহা, তামা, সোনা-রুপা, পাথর ও পোড়ামাটির কিছু দ্রব্য। আগেই উল্লেখ করেছি, সেগুলো সংগ্রহ ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে বিভিন্ন জাদুঘরে সংরক্ষণ করা হয়েছে।

বাংলাদেশের প্রাচীন শিল্পকর্মের মধ্যে শিল্পনৈপুণ্যে ও কারুকাজে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলো কষ্টিপাথর বা কালো পাথরে তৈরি মূর্তি। এই বিখ্যাত মূর্তিগুলো ঢাকায় জাতীয় জাদুঘরে ও বরেন্দ্র জাদুঘরে গেলে দেখা যায়। পোড়ামাটির ফলকচিত্র, পাথরে খোদাই করা ফলক ও শিলালিপি বিখ্যাত প্রাচীন শিল্পকর্ম। মাটি খুঁড়ে যেগুলো পাওয়া গিয়েছে সেগুলো বিভিন্ন জাদুঘরে রয়েছে। ঐতিহ্যবাহী সেরূপ ফলক এখনও অনেক পুরোনো ইমারতে, মসজিদের দেয়ালে, মন্দিরের দেয়ালে শোভা পাচ্ছে। এরূপ ফলকচিত্রমণ্ডিত বিখ্যাত ইমারতগুলো হলো- রাজশাহীর ছোট সোনা মসজিদ, বাঘা মসজিদ, কুসুম্বা মসজিদ, পুঠিয়ার রাজবাড়ির মন্দির, খুলনার বাগেরহাটে ষাট গম্বুজ মসজিদ, খান জাহান আলীর মসজিদ। এগুলো প্রাচীন স্থাপত্যকলার নিদর্শন হিসেবেও উল্লেখযোগ্য। এরূপ আরও কিছু প্রাচীন স্থাপত্য শিল্পের নিদর্শন হলো- ঢাকার বড়ো কাটরা, ছোটো কাটরা, লালবাগের দুর্গ, বিনত বিবির মসজিদ, খান মোহাম্মদ মৃধার মসজিদ, ঢাকেশ্বরী মন্দির, তারা মসজিদ, আহসান মঞ্জিল, সাতগম্বুজ মসজিদ, নারায়ণগঞ্জের হাজিগঞ্জ দুর্গ, সোনাকান্দা দুর্গ, মুন্সীগঞ্জের ইদ্রাকপুর দুর্গ, পাবনার জোড়বাংলা মন্দির, ফরিদপুরের মথুরাপুর দেউল, জোড়বাংলা মন্দির, কিশোরগঞ্জের এগারো সিন্দুর

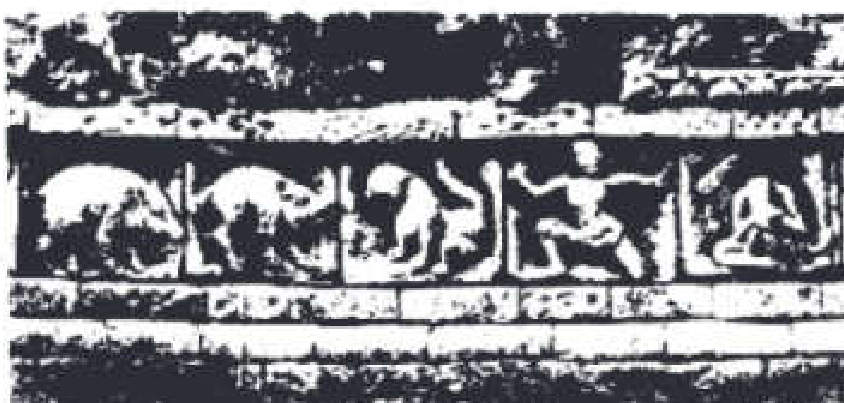

ময়নামতির শালবন বিহারের দেয়ালে পোড়ামাটির ফলকচিত্র

সাদী মসজিদ, শাহ্ মোহাম্মদ মসজিদ, সিলেটের শাহ জালালের মাজার, শাহ পরানের মাজার, জয়ন্তীয়াপুর মেগালিথ পাথর, কুমিল্লার সতেরো রত্ন মন্দির, চট্টগ্রামের বায়েজিদ বোস্তামীর মাজার এবং এমন আরও কিছু ইমারত ও স্থান।

কাজ : বগুড়ার মহাস্থান গড়ে প্রাপ্ত ৫টি প্রাচীন শিল্পকর্মের নাম লেখো।

পাঠ : ৩

জীবনযাপনে চারু ও কারুকলা

আদিকাল থেকেই চারু ও কারুকলার উপর নির্ভর করে জীবনযাপন করে আসছে বহু মানুষ। পেশা হিসেবেই তারা শিল্পকর্মকে বেছে নিয়েছে। আমাদের লোকশিল্পীরা ও কারুকাজের শিল্পীরা তাদের তৈরি শিল্পকর্ম বিক্রি করে সেই অর্থ দিয়েই জীবনযাপনের প্রয়োজন মিটিয়ে যাচ্ছে। যেমন শখের জিনিস পোড়ামাটির পুতুল, শখের হাঁড়ি, কাঠের নকশা ও ছবিবহুল পুতুল, হাতি, ঘোড়া, গ্রামের মেয়েদের নকশিকাঁথা ইত্যাদি অনেক আগে থেকেই মানুষ অর্থের বিনিময়ে সংগ্রহ করে আসছে। পাটের তৈরি শিকা, নানারকম ব্যাগ ও টেবিলম্যাটসহ বহু ব্যবহারের জিনিসপত্র এখন বাণিজ্যিকভাবেও সফল। কুমারদের তৈরি হাঁড়ি-পাতিল, কলসি ছাড়াও মাটি দিয়ে বর্তমানে বহু কারুশিল্প তৈরি হচ্ছে। যেমন- ছোটো-বড়ো নানা আকৃতির ফুলদানি, মাটির ভাস্কর্য, মাটির গয়না ইত্যাদি। কাঠ, বাঁশ ও বেতের নানারকম আসবাবপত্র তৈরিতে, সংগীতচর্চার যন্ত্র তৈরিতে, ছবি ও নকশা ফুটিয়ে তোলার জন্য বহু চারু ও কারুশিল্পী কাজ করে চলেছে।

বাংলাদেশের তাঁতের শাড়ি রং,নকশা ও ছবির জন্য দেশে-বিদেশে বিখ্যাত। জামদানির বাহারি নকশা রঙিন সুতার বুনটের মাধ্যমে দক্ষ কারুশিল্পীরাই করে থাকেন। নকশাদার তাঁতের শাড়ির কদর শুধু দেশেই নয়, বিশ্বের বহু দেশের মানুষ আগ্রহসহকারে তা সংগ্রহ করে। যেমন- জামদানি, ঢাকাই বিটি, টাঙ্গাইল শাড়ি এবং আদিবাসীদের তাঁতে তৈরি নকশাদার রঙিন পোশাক।

বাংলাদেশে বর্তমানে অনেকগুলো চারুকলা ও কারুশিল্প শিক্ষার প্রতিষ্ঠান রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত যেমন রয়েছে, তেমনি বেসরকারি পর্যায়েও রয়েছে। এসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে প্রতিবছর প্রায় চার শতাধিক চিত্রশিল্পী উত্তীর্ণ হয়। বিভিন্ন সংস্থায় নিজেদের চারু ও কারুশিল্পের অবদান রাখতে তাঁরা সমর্থ হয়। যেমন- বিজ্ঞাপনী সংস্থায় বই–পুস্তকের ছবি আঁকায়, খবরের কাগজে, সিনেমাশিল্পে, টেলিভিশনের সেট নির্মাণ থেকে শুরু করে বিভিন্ন শিল্পকর্মে, পোশাকশিল্পে, ওষুধশিল্প ও বিভিন্ন কলকারখানায়। এছাড়াও ইনটেরিয়র ডিজাইনসহ বহু স্থাপনাশিল্প সুন্দর ও সুচারুভাবে সম্পন্ন করে চলেছে এদেশের চারু ও কারুশিল্পীরা

ছবি এঁকে, প্রদর্শনী করে, ভাস্কর্যশিল্প তৈরি করেও চিত্রশিল্পীরা উপার্জন করে থাকেন। চিত্রপ্রদর্শনীতে আজকাল অনেক শিল্পীর ছবি বিক্রি হয়। বাঁশ, বেত, পাথর, মাটি ইত্যাদি মাধ্যমে নির্মিত নান্দনিক শিল্পকর্ম ও কারুশিল্প অনেক শিল্পবোদ্ধা সংগ্রহ করেন এবং তাঁদের ঘরবাড়ি সাজান।

তাই শুধু জীবনযাপনের প্রয়োজনেই চিত্রশিল্পীরা কাজ করছেন না, একই সঙ্গে সুন্দর ও রুচিশীল জীবনযাপনের জন্য, সংস্কৃতিসমৃদ্ধ সমাজগঠনে, সর্বোপরি দেশের উন্নতির ক্ষেত্রে চারু ও কারুশিল্পীরা বিশেষ অবদান রাখতে সমর্থ।

কাজ : প্রাত্যহিক জীবনে চারু ও কারুকলার ব্যবহারিক ক্ষেত্র নিয়ে মাইন্ডম্যাপ তৈরি করো।

ফর্মা-২

নমুনা প্রশ্ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। মেগালিথ পাথর কোথায় পাওয়া গেছে?

ক. ফরিদপুর খ. জয়ন্তীয়াপুর
গ. নারায়ণগঞ্জ ঘ. মুন্সীগঞ্জ

২। নিচের কোনগুলো লোকশিল্প?

ক. নকশিকাঁথা, পোড়ামাটির হাতি, মাটির হাঁড়ি

খ. মাটির হাঁড়ি, মাটির কলস, নকশিকাঁথা

গ. শখের হাঁড়ি, কাঠের পুতুল, নকশিকাঁথা

ঘ. উপরের সবগুলো

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১। লোকশিল্পীদের শিল্পকর্মের পাঁচটি উদাহরণ দাও।

২। কারুশিল্পীদের শিল্পকর্মের পাঁচটি উদাহরণ দাও।

৩। চারু ও কারুশিল্পীরা উপার্জন ও সৌন্দর্যবর্ধনের জন্য কাজ করে চলেছেন - এমন দশটি বিষয় ও সংস্থানের নাম লেখো।

৪। বাঙলা অঞ্চলের বা বাংলাদেশের প্রাচীন শিল্পকলার বিবরণ সংক্ষেপে বর্ণনা করো।

৫। কষ্টিপাথরের মূর্তি, পোড়ামাটির ফলক ও শিলালিপি কেন প্রাচীন শিল্পকলা হিসেবে টিকে আছে? বর্তমানে এগুলো কোথায় সংরক্ষিত রয়েছে?

৬। মাটি খুঁড়ে কোন প্রাচীন জনপদ আবিষ্কৃত হয়েছে? যে কোনো ২টি জনপদ ধ্বংসে হওয়ার কারণ বর্ণনা করো।

৭। কালো পাথরের ভাস্কর্য সম্পর্কে সংক্ষেপে লেখো।

৮। জাদুঘরে বা অন্য কোনো স্থানে পোড়ামাটির ফলক দেখে থাকলে তার বিবরণ দাও।

৯। নিচে উল্লেখিত যে কোনো একটি স্থান পরিদর্শন করে থাকলে তোমার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করো।

ময়নামতি, মহাস্থানগড়, পাহাড়পুর, ষাটগম্বুজ মসজিদ, কান্তজির মন্দির, বাঘা মসজিদ, পুঠিয়ার রাজবাড়ি মন্দির, তারা মসজিদ।

১০। প্রাচীন শিল্পকলাগুলো কেন ঐতিহ্যবাহী সে সম্পর্কে তোমার অভিমত ব্যাখ্যা করো।

দ্বিতীয় অধ্যায়

বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে চারুশিল্প ও শিল্পীরা

'স্বাধীনতা' শব্দ নিয়ে বিপ্লবী চিত্রের মিছিল

এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা–

- তৎকালিন পূর্ব–পাকিস্তানের সাথে পশ্চিম–পাকিস্তানের সাংস্কৃতিক ভিন্নতা বর্ণনা করতে পারব।
- স্বাধীনতা যুদ্ধ ও পূর্ব–পাকিস্তানের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ আন্দোলনে চারুশিল্পীদের ভূমিকা বর্ণনা করতে পারব।
- আমাদের ভাষা ও সংস্কৃতিতে চারু ও কারুশিল্পীদের অবদান ব্যাখ্যা করতে পারব।

এক

বাংলাদেশের অভ্যুদয় হঠাৎ করে একদিনে ঘটেনি। ধারাবাহিকভাবে দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশের মানুষ স্বাভাবিকভাবে বেঁচে থাকার জন্য সংগ্রাম করে এসেছে। ব্রিটিশরা দুশো বছর এদেশ শাসনের পর ১৯৪৭ সালে সম্পূর্ণ ভারত বা ভারতবর্ষ ভাগ হয়ে দুটি দেশ হয়। মুসলমান-অধ্যুষিত বা ইসলাম ধর্মীয় মানুষদের জন্য পাকিস্তান– আরেকটি ভারত নামেই স্বাধীনতা লাভ করে।

পাকিস্তানের আবার দুটি অংশ– পূর্ব–পাকিস্তান ও পশ্চিম-পাকিস্তান। ভারতবর্ষের মানচিত্র দেখলে পরিষ্কারভাবে বোঝা যাবে, ভারতবর্ষের পশ্চিম কোণে অবস্থিত পশ্চিম–পাকিস্তান এবং প্রায় সর্ব পূর্বে পূর্ব–পাকিস্তান। দুই অঞ্চলের মধ্যে ছিল বিশাল দূরত্ব।

ভারতবিভাগের সেই সময় ধর্মের দোহাই দিয়ে মানবিকতার চরম বিপর্যয় ঘটেছিল, যার নাম সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। পূর্ব–পাকিস্তান থেকে চলে যেতে বাধ্য হলো হিন্দুরা। অহেতুক হত্যা, নির্যাতন, জ্বালাও পোড়াও করে লক্ষ লক্ষ নিরীহ হিন্দু-মুসলমানকে হত্যা করা হলো। এই দাঙ্গা ও নিরীহ মানবসন্তান হত্যা ভারত-পাকিস্তানের স্বাধীনতার ইতিহাসে এক কলঙ্কিত অধ্যায়।

পূর্ব–পাকিস্তান ও পশ্চিম–পাকিস্তান একই দেশ হলেও একমাত্র ধর্ম ছাড়া আর কোনোকিছুতেই দুই দেশের মধ্যে মিল ছিল না। পূর্ব–পাকিস্তানের বেশিরভাগ মানুষের ভাষা বাংলা। ৯৯ ভাগ মানুষই বাংলায় কথা বলে। একমাত্র দেশভাগের সময় ও দাঙ্গায় যারা ভারতের অন্যান্য অঞ্চল থেকে চলে আসে এসেছিল তারা কথা বলত উর্দু ও হিন্দি ভাষায়। অল্প কয়েকদিনে তারাও বাংলা শিখে ফেলল। পোশাক, খাওয়াদাওয়া, জীবনযাপন, সংস্কৃতি দুই পাকিস্তানের সবকিছুই ভিন্ন। এমনকি জলবায়ু ও প্রাকৃতিক পরিবেশও পশ্চিম-পাকিস্তান থেকে ভিন্ন।

পশ্চিম–পাকিস্তান আয়তনে পূর্ব–পাকিস্তানের চেয়ে অনেক গুণ বড় হলেও সেখানে লোকসংখ্যা ছিল পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যার ৪৫ ভাগ। পূর্ব–পাকিস্তানে ৫৫ ভাগ। পশ্চিম–পাকিস্তানের ৪টি প্রদেশে ছিল ভিন্ন ভিন্ন ভাষা। পাঞ্জাবি, সিন্ধি, বেলুচ, পশতু ও উপজাতীয়দের মিশ্রিত ভাষা। মাত্র ১৫ ভাগ মানুষ কথা বলত উর্দু ভাষায়। এমন একটি অবস্থায় পাকিস্তানের স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম নেতা ও তৎকালীন গভর্নর জেনারেল মহম্মদ আলি জিন্নাহ ঢাকায় এসে ঘোষণা দিলেন, পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে একমাত্র উর্দু।

জোরালো প্রতিবাদ জানাল পূর্ব–পাকিস্তানের ছাত্র-জনতা– শুধু উর্দু হবে কেন? ৫৫ ভাগ মানুষ বাংলায় কথা বলে। বাংলাকেও উর্দুর পাশাপাশি রাষ্ট্রভাষা করা হোক।

কিন্তু পাকিস্তানের শাসকেরা পূর্ব–পাকিস্তানের বাঙালিদের এই ন্যায্য অধিকারের কোনো গুরুত্ব দিল না ; বরং অবহেলাই করল। ধীরে ধীরে দেখা গেল স্বাধীন দেশের মানুষদের সমান অধিকার থাকলেও শুধু ভাষার বিষয়েই নয়, সব ক্ষেত্রেই শাসকরা পূর্ব–পাকিস্তানের মানুষদের অবহেলা করছে। চাকরির ভালো ও উচ্চপদগুলো পশ্চিম–পাকিস্তানের মানুষদের দিচ্ছে। বাঙালিরা উপযুক্ত ও গুণী হলেও তাদের বঞ্চিত করে পশ্চিম-পাকিস্তানের অপেক্ষকৃত কম অভিজ্ঞদের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে বসিয়ে বাঙালিদের অপমান করে যাচ্ছে। সেনাবাহিনী, পুলিশবাহিনীতে বেশিরভাগই পশ্চিম-পাকিস্তানের মানুষকে ঢোকানো হচ্ছে। কল-কারখানা, ব্যবসা-বাণিজ্য, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান সর্বত্রই পশ্চিম-পাকিস্তানের মানুষদের একরকম জোর করে বসিয়ে দিয়ে পূর্ব–পাকিস্তানের মানুষদের উপর শোষণ, আধিপত্য বিস্তারের ব্যবস্থা চলতে থাকে।

পাকিস্তান সরকার বাংলা ভাষাকে বিকৃত করার চেষ্টা করে নানাভাবে। বাংলা গান, রবীন্দ্রসংগীত এবং বাঙালির অন্যান্য সামাজিক ও সাংস্কৃতিক চর্চার উপর বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়। শুধু তা নয়, অনেক সময় শাসকগোষ্ঠীর পেটোয়া বাহিনী এর জন্য অত্যাচার চালায় সাধারণ মানুষদের ওপর। শেষ পর্যন্ত ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি মাতৃভাষার দাবিতে রাজপথে বের হওয়া ছাত্র-জনতার মিছিলে পাকিস্তানি পুলিশ বাহিনীর গুলিতে শহিদ হন– সালাম, বরকত, রফিক, জব্বার, শফিকসহ আরো অনেকে।

এভাবে ১৯৪৮, ১৯৫২, ১৯৫৪, ১৯৫৬, ১৯৫৮ এবং পুরো ষাটের দশক পূর্ব–পাকিস্তানের মানুষ তথা বর্তমান বাংলাদেশের মানুষ তাদের ন্যায্য অধিকার আদায়ের জন্য বার বার প্রতিবাদ করেছে, আন্দোলন করেছে, সংগ্রাম করেছে। ফলে অনেক রাজনীতিবিদ, শিক্ষাবিদ, সংস্কৃতিসেবী, ছাত্র-জনতা, পাকিস্তানের স্বৈরশাসকবর্গের দ্বারা বারে বারে নির্যাতিত হয়েছে। সরকার মিথ্যা অভিযোগ এনে তাদের জেলে পুরেছে, বহু নেতা ও সাধারণ মানুষকে গুলি করে ও নানাভাবে নির্যাতন চালিয়ে হত্যা করেছে। অনেক জনপদ আগুন জ্বালিয়ে ধ্বংস করে দিয়েছে। কিন্তু বাঙালিরা শত অত্যাচারেও কখনো পিছিয়ে যায়নি। ১৯৪৮ থেকে ১৯৭১ এই ২৩ বছর সংগ্রাম চালিয়ে শেষ পর্যন্ত ১৯৭১ সালে ৯ মাস অস্ত্র নিয়ে যুদ্ধ করে বাঙালিরা পূর্ব–পাকিস্তানকে স্বাধীন করেছে– নতুন দেশের নাম হয়েছে বাংলাদেশ।

কাজ : পূর্ব এবং পশ্চিম–পাকিস্তানের সংস্কৃতির পার্থক্য দেখিয়ে ৫টি বাক্য লেখো।

দুই

চারু ও কারুকলা ইনস্টিটিউট

পূর্ব–পাকিস্তান বা বাংলাদেশে ছবি আঁকার প্রতিষ্ঠান চারু ও কারুকলা ইনস্টিটিউট (বর্তমানে চারুকলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়) প্রতিষ্ঠিত হয় ১৫ই নভেম্বর ১৯৪৮ সালে। চারুকলার প্রতিষ্ঠাতা শিল্পী জয়নুল আবেদিন, কামরুল হাসান, শফিউদ্দিন আহমদ, খাজা শফিক আহমেদ, শফিকুল আমিন মোহাম্মদ কিবরিয়া - এঁরা সবাই চিন্তায় ও চেতনায় ছিলেন প্রগতিশীল, অসাম্প্রদায়িক এবং বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও সচেতন। তাঁরা শুধু ছবি আঁকা বিষয়টি হাতে-কলমে শিখবে সেজন্যে, শিল্পী বানাবার জন্য চারুকলা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করেননি। তাঁরা চেয়েছেন এই চারুকলা ইনস্টিটিউটকে কেন্দ্র করে ছবি আঁকা, ভাস্কর্য ও অন্যান্য শিল্পের মাধ্যমে নানারকম সংস্কৃতি ও তাদের চর্চা ও সমন্বয় ইত্যাদিও প্রসারিত হবে। বাংলাদেশের মানুষের মধ্যে বাঙালির নিজস্ব ঐতিহ্য সম্পর্কে সচেতনতা বাড়বে। চারুকলা চর্চার প্রথম দিকে যাঁরা ছাত্র হিসেবে ভর্তি হয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে অনেকেই প্রতিষ্ঠাতা শিল্পীদের চিন্তা ও চেতনাকে ধারণ করেই শিল্পচর্চা করেছেন।

তাই দেখা যায়, ১৯৪৮ থেকে ১৯৫২-র ভাষা আন্দোলন, ১৯৫৪ থেকে ১৯৫৮ পর্যন্ত রাজনৈতিক পরিবর্তন, ষাটের দশকের শুরুতেই আইউব খানের মার্শাল ল-বিরোধী আন্দোলন ও চাপিয়ে দেওয়া হামিদুর রাহমান শিক্ষা কমিশনের বিরুদ্ধে আন্দোলন, ৬ দফা দাবি নিয়ে আন্দোলন, ১৯৬৮ ও ৬৯-এ বিশাল গণআন্দোলন করে স্বৈরাচারী আইউবের পতন ঘটানো ইত্যাদি সব সংগ্রামে দেশের ছাত্র-জনতার সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করেছেন এদেশের চিত্রশিল্পীরা। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে সুস্পষ্ট রায়ের পরও বাঙালির হাতে পাকিস্তানের কর্তৃত্ব না দেওয়া ও পরবর্তী অসহযোগ আন্দোলন, এবং সবশেষে ৯ মাসের মুক্তিযুদ্ধ– সর্বত্রই চিত্রশিল্পীরা কখনো প্রত্যক্ষভাবে কখনো পরোক্ষভাবে অংশ নিয়েছে।

শিল্পগুরু জয়নুল আবেদিন, কামরুল হাসানসহ কাইয়ুম চৌধুরী, হাশেম খান, নিতুন কুন্ডু, ইমদাদ হোসেন, প্রাণেশ মণ্ডল, প্রফুল্লরায়, রফিকুন নবী, আনোয়ার হোসেন, গোলাম সারোয়ার, বিজয় সেন, মাহমুদুল হক, নাসির বিশ্বাস, বীরেন সোম, মঞ্জুরুল হাই, আবুল বারক আলভী, রেজাউল করিম, সৈয়দ আবদুল্লাহ খালেদ, এম এ খালেদ, শাহাদত চৌধুরী, মাহবুবুল আমিন, স্বপন চৌধুরী, শাহাবুদ্দিন প্রমুখ শিল্পী আন্দোলনে প্রত্যক্ষভাবে কাজ করেছেন।

একদিকে তাঁরা তাঁদের তুলিকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করেছেন, আবার কোনো কোনো শিল্পী আগ্নেয়াস্ত্র নিয়েও সরাসরি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। যুদ্ধকালীন প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রকাশিত শিল্পী কামরুল হাসানের

আঁকা 'এই জানোয়ারদের হত্যা করতে হবে', শিল্পী প্রাণেশ মণ্ডলের আঁকা, 'বাংলার মায়েরা- মেয়েরা সকলেই মুক্তিযোদ্ধা' কিংবা শিল্পী দেবদাস চক্রবর্তীর আঁকা 'বাংলার হিন্দু, বাংলার বৌদ্ধ, বাংলার খ্রিস্টান, বাংলার মুসলমান, আমরা সবাই বাঙালি'। এই পোস্টারগুলো মুক্তিযোদ্ধাদের প্রেরণার অন্যতম উৎস হিসেবে কাজ করেছে।

কাজ : চারু ও কারুকলা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠায় শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের সাথে আর কোন কোন শিল্পী যুক্ত ছিলেন লেখো।

তিন

শহিদমিনার ও ৬ দফা

১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলনে পটুয়া কামরুল হাসান এবং সেই সময়ের ছাত্র ও পরে শিল্পী মুর্তজা বশীর, ইমদাদ হোসেন, আবদুর রাজ্জাক, সিরাজী, কাজী আবদুর রউফ, আবদুর সবুর, আমিনুল ইসলাম প্রমুখের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। শিল্পী বিজন চৌধুরী ও মুর্তজা বশীর ভাষা আন্দোলন ও শাসকদের নির্যাতনের বিরুদ্ধে ড্রইং ও কাঠ খোদাই, লিনোকাট মাধ্যমে বেশ কিছু ছবি তৈরি করেছিলেন। স্বশিক্ষিত চিত্রশিল্পী কাজী আবুল কাশেম 'দৌপেয়াজা' ছদ্মনামে ভাষা আন্দোলনবিষয়ক কার্টুন এঁকে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। শিল্পীদের এসব ছবি বাংলাদেশের ক্ষেত্রে, তথা নিজেদের অধিকার আদায়ে জনগণকে জাগিয়ে তোলার ক্ষেত্রে ইতিহাসের অংশ। শহিদমিনারের স্থপতিও একজন চিত্রশিল্পী। তিনি শিল্পী হামিদুর রহমান। তাঁকে সেই সময় সহযোগিতা করেছিলেন ভাস্কর নভেরা আহমেদ। ১৯৫৬ সালে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়।

বাংলাদেশের মানুষের অধিকার আদায়ের ক্ষেত্রে যেসব রাজনৈতিক দল আন্দোলন করে চলেছে– তাদের প্রচারে, পোস্টার আঁকা, কার্টুন আঁকা, প্রচারমূলক নানারকম ছবি আঁকা, ফেস্টুন ও ব্যানার তৈরি করা, বক্তৃতা ও আন্দোলনের মঞ্চসজ্জা, সবকিছুতে শিল্পীরা প্রত্যক্ষভাবে জড়িত থাকতেন। শিশুসংগঠন খেলাঘর ও কচি-কাঁচার মেলার মাধ্যমে চিত্রশিল্পীরা শিশুদেরকে নিজেদের অধিকার শিল্প, সাহিত্য ও ঐতিহ্য বিষয়ে আগ্রহী করে তুলেছিলেন।

৬ দফার লোগো, প্রচারের পোস্টার ও মঞ্চসজ্জা করেছিলেন শিল্পী হাশেম খান। প্রতীকী মঞ্চসজ্জার নকশা প্রচ্ছদে ব্যবহার করে দৈনিক ইত্তেফাক ৬ দফার বিষয়ে বিশেষ সংখ্যা বের করে। ১৯৬৭ থেকে পরপর ৫ বছর ১৯৭১ পর্যন্ত এরকম চলতে থাকে। একুশে ফেব্রুয়ারি উপলক্ষে চিত্রশিল্পীরা শহিদমিনারে বড়ো বড়ো ক্যানভাসে, পূর্ব–পাকিস্তান তথা বাংলাদেশের মানুষের অধিকার, শিক্ষা, বাণিজ্য, অর্থনীতি ও সংস্কৃতি ইত্যাদি ক্ষেত্রে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর বঞ্চনা ও বাঙালিদের ওপর নির্যাতনের বিষয়ে ছবি এঁকে প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করতেন। চিত্রপ্রদর্শনী শুধু গ্যালারিগৃহে নয়, জনতার জন্য গৃহের বাইরে যেমন– 'বিদ্রোহী স্বরবর্ণ' নামে ১৩টি স্বরবর্ণ, ছড়া ও ছবির একটি প্রদর্শনী জনগণের মধ্যে বিপুল সাড়া তুলেছিল। বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ক্ষেত্রে এই ধরনের চিত্রপ্রদর্শনী ইতিবাচক ভূমিকা রেখেছিল।

দলীয় কাজ : বাংলাদেশের অধিকার আদায়ের আন্দোলনে শিল্পীদের অবদান সম্পর্কে ১০টি বাক্যে তোমাদের মতামত তুলে ধরো।

চার

আলপনা

১৯৫৩ সাল থেকে প্রতিবছর একুশে ফেব্রুয়ারি উপলক্ষে ভোরবেলা আলপনা আঁকা রাজপথে খালিপায়ে প্রভাতফেরি করে ভাষাশহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হতো। পাক-সরকার হঠাৎ এই রেওয়াজে বাধার সৃষ্টি করল। তারা জানালো আলপনা আঁকা যাবে না। আলপনা হিন্দু ধর্মের বিষয়, মুসলমানদের জন্য আলপনা

আঁকা নিষেধ ইত্যাদি। কিন্তু এসব ছিল পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর ধর্মের দোহাই দিয়ে বাঙালিদের সংস্কৃতিচর্চায় বাধা দেওয়ার ষড়যন্ত্র। চিত্রশিল্পীরা পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর এসব মিথ্যা যুক্তি মানেননি। নিষেধ থাকা সত্ত্বেও চিত্রশিল্পীরাই বিশেষ বিশেষ রাস্তায় আলপনা আঁকতেন। চিত্রশিল্পীরাই আলপনাকে যথাযথ গুরুত্ব দিয়েছেন। আলপনা ব্যবহার বাঙালি সংস্কৃতির একটি বিশেষ বিষয়। সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও জাতীয় বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠানে বা যে-কোনো শুভ কাজে আলপনার ব্যবহার এখন স্বাভাবিক সংস্কৃতি। যেমন– বিজয় দিবসে, স্বাধীনতা দিবসে, ঈদ উৎসবে, বিয়ের অনুষ্ঠানে, স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের আনন্দ অনুষ্ঠানে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে, জন্মদিনের অনুষ্ঠানে আলপনার ব্যবহার সুন্দর ও শুদ্ধভাবে কাজ করার অনুপ্রেরণা। বাংলাদেশের চিত্রশিল্পীরাই আলপনাকে বাঙালির সমাজজীবনে স্বাভাবিক সংস্কৃতিচর্চা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছেন, যা বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

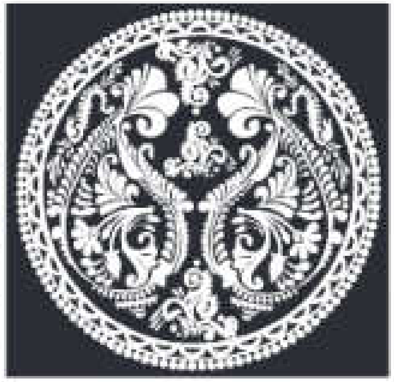

আলপনা

দলীয় কাজ : আমরা বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আলপনা করি কেন?

পাঁচ

নবান্ন ও বাংলা নববর্ষ

১৯৭০ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারি। শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের নেতৃত্বে ১০/১২ জন তরুণ চিত্রশিল্পী, কবি ও সাংবাদিকের উদ্যোগে শিল্পকলা একাডেমিতে বিশাল আকারে অনুষ্ঠিত হয় নবান্ন চিত্রপ্রদর্শনী।

ষড়ঋতুর দেশ বাংলাদেশ। অগ্রহায়ণ মাসে কৃষক ফসল (ধান) কেটে ঘরে তোলে। সারা বছরের পরিশ্রম শেষে চাষির ঘরে-ঘরে তখন আনন্দ। নতুন ধানের পিঠা, পায়েস খাওয়া, আনন্দ অনুষ্ঠান করা, যেমন– কবিগানের লড়াই, হাডুডু, দাড়িয়াবান্ধা খেলা, যাত্রাপালার আয়োজন এবং কখনো কখনো মেলা। গ্রামের সেই নবান্ন উৎসবকে নতুনরূপে শহরে পালন করতে শুরু করলেন চিত্রশিল্পীরা। ছবি এঁকে বিশাল প্রদর্শনী হলো। শিল্পাচার্য তাঁর বিখ্যাত 'নবান্ন' নামের দীর্ঘ স্ক্রল ছবিটি এই নবান্ন প্রদর্শনী উপলক্ষেই আঁকলেন, যার দৈর্ঘ্য ৬০ ফুট এবং প্রস্থ ৬ ফুট।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদের বাংলা নববর্ষে 'মঙ্গল শোভাযাত্রা'

নবান্ন প্রদর্শনী জনগণের মধ্যে বিপুল সাড়া জাগিয়েছিল। শিল্পীরা তারপরই শুরু করলেন বাংলা নববর্ষ উপলক্ষে 'কালবৈশাখী' নামে একটি চিত্রপ্রদর্শনী। বর্তমান চারুকলা অনুষদে এই প্রদর্শনীটিও মানুষের মন জয় করেছিল। শিল্পীরা যেসব ছবি এঁকেছিলেন তার বিষয় ছিল বাংলার মানুষের সুখ-দুঃখ, চিন্তা, স্বপ্ন, ষড়ঋতুতে প্রকৃতির ভিন্ন

ভিন্ন রূপ ইত্যাদি। সেই প্রদর্শনী থেকেই পরবর্তীকালে কিছুটা পরিবর্তন হয়ে রূপ নেয় বর্তমান পহেলা বৈশাখ অনুষ্ঠান ও মেলা। বর্তমানে নিয়মিতভাবেই বাংলা নববর্ষ ও নবান্ন উৎসব চারুকলার চত্বরে বিপুল আগ্রহ ও উদ্দীপনা নিয়ে ঢাকাসহ সারা দেশের মানুষ পালন করে যাচ্ছে। তাই সহজেই বলা যায়, চিত্রশিল্পীদের চিন্তা-চেতনা ও শিল্পকর্মের মাধ্যম হিসেবে নববর্ষ উৎসব ও নবান্ন বাংলার মানুষকে নিজের দেশের প্রতি, নিজ সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের প্রতি ভালোবাসায় স্নিগ্ধ হতে ও গর্ববোধ করতে উদ্বুদ্ধ করেছে।

বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে সেই সময়ে নবান্ন চিত্রপ্রদর্শনী ছিল বিশাল ও বিপ্লবী পদক্ষেপ। যাঁরা এই প্রদর্শনীর উদ্যোগ নেন তাঁদের সামনে ছিল অনেক বাধা ও ভয়ভীতি। সেই সময়ের পাকিস্তানি সামরিক সরকার এই ধরনের উদ্যোগকে মনে করত পাকিস্তানের আদর্শবিরোধী। অন্যদিকে কিছু সংগঠন ও ব্যক্তি অপপ্রচার করে বলতে লাগল, এই প্রদর্শনীর পেছনে শিল্পাচার্য জয়নুল ও উদ্যোক্তা শিল্পীদের অন্য কোনো উদ্দেশ্য আছে। কিন্তু শিল্পীরা অশেষ চেষ্টায় সব শিল্পীকে দিয়ে ছবি আঁকিয়ে এমন একটি প্রদর্শনী করলেন, যা দেখে মানুষ বিস্মিত ও বিমোহিত হয়ে গেল। প্রায় হারিয়ে যাওয়া নবান্ন উৎসবের আনন্দকে শহরের মানুষদের নতুন করে মনে করিয়ে দিলেন শিল্পীরা। প্রায় সব শিল্পীই এঁকেছেন বাংলার মানুষের সুখ-দুঃখ আনন্দ-বেদনা ও প্রকৃতির সঙ্গে যুদ্ধ করে বেঁচে থাকার নানারকম চিত্র। অন্য দিকে আছে মহাজনের শোষণ ও নানাভাবে বঞ্চিত হওয়ার ছবি। বাংলাদেশের নদী-নালা মাঠ-ঘাট ও বিভিন্ন ঋতুতে প্রকৃতির রূপবৈচিত্র্যের ছবি। নবান্ন চিত্রপ্রদর্শনীর সবচেয়ে বড়ো অর্জন শিল্পাচার্যের ৬০ ফুট লম্বা ছবি।

ছবিটি তিনি কালো কালিতে জোরালোভাবে তুলিতে ড্রইং করে এঁকেছেন। তারপর সামান্য জলরঙের প্রলেপ দিয়েছেন। ছবি কালো রঙে হলেও আঁকার গুণে মনে হয় রঙিন ছবিই দেখছি। এত দীর্ঘ আকারের ছবি বাংলাদেশের আর কোনো শিল্পী আঁকেননি। ছবিটি একটু মোটা কাগজে আঁকা। তাই গোলাকার ভাঁজ করে রাখতে হয়। শুধু প্রদর্শনীর সময় মেলে ধরতে হয়। 'নবান্ন' স্ক্রল চিত্রটি শিল্পকলা জগতের মূল্যবান সম্পদ।

নবান্ন প্রদর্শনীর প্রধান উদ্যোক্তা ও উপদেষ্টা ছিলেন শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন। অন্যান্য সদস্যরা হলেন– শিল্পী হাশেম খান, শিল্পী রফিকুন নবী, লেখক ও শিল্পী বুলবন ওসমান, শিল্পী মঞ্জুরুল হক, আবুল বারক আলভী, বীরেন সোম, মতলুব আলী, শিল্পী ও সম্পাদক শাহাদত চৌধুরী, কবি ও সাংবাদিক মো. আকতার (আলবদরদের দ্বারা ১৯৭১-এ শহিদ) প্রমুখ।

নবান্ন প্রদর্শনী উপলক্ষে 'নবান্ন' নাম দিয়ে দেশের খ্যাতনামা ও নবীন কবিদের কবিতা ও ছড়াসহ একটি পুস্তিকাও প্রকাশিত হয়েছিল।

কাজ : নবান্ন ও বাংলা নববর্ষে যেসব ছবি আঁকা হয়েছে সেসব বিষয় সম্পর্কে পাঁচটি বাক্য লেখো।

ছয়

স্বাধীনতা ও বিপ্লবী চিত্রের মিছিল

১৯৭০ সালে পাকিস্তানের দুই অংশ মিলিয়ে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সবচেয়ে বেশি ভোট পেল আওয়ামী লীগ। কথা ছিল শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে পুরো পাকিস্তানের সরকার গঠন করবে আওয়ামী লীগ। কিন্তু বেঁকে বসলেন তৎকালীন সামরিক সরকারপ্রধান জেনারেল ইয়াহিয়া ও পশ্চিম পাকিস্তানের নেতা জুলফিকার আলি ভুট্টো। অযৌক্তিকভাবে তারা বললেন শেখ মুজিব ও আওয়ামী লীগকে সরকার গঠন করতে দেবেন না। এর সহজ অর্থ হলো বাঙালিরা ভোটে জিতলেও বাঙালিদের হাতে পাকিস্তানের একচ্ছত্র ক্ষমতা দেওয়া যাবে না। ক্ষমতার অংশীদার তারাও হবে। ফলে বিক্ষোভের দাবানল জ্বলে উঠল সারা পূর্ব-পাকিস্তানে অর্থাৎ বর্তমান বাংলাদেশে। নিয়ম ও আইনের মধ্য দিয়েই নির্বাচন হয়েছে এবং আওয়ামী লীগ বা বাঙালিরা সবচেয়ে বেশি আসনে জিতেছে। সুতরাং ভুট্টো ও ইয়াহিয়ার অন্যায় ঘোষণা বাঙালিরা কেউই মেনে নিতে পারল না। শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭১ সালের ২রা মার্চ অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দিলেন।

২০১৫

এ দেশ পাক সরকারের নির্দেশে চলবে না। পূর্ব-পাকিস্তানের মানুষ এখন থেকে শেখ মুজিবের নির্দেশে চলবে। আর এ নিয়ম চলবে যতদিন বাঙালির অধিকার প্রতিষ্ঠা না হয়।

শিল্পী দেবদাস চক্রবর্তীর আঁকা পোস্টার

শিল্পী প্রাণেশ কুমার মন্ডলের আঁকা পোস্টার

তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তানের চিত্রশিল্পীরা সবাই এক জোট হয়ে আলোচনায় বসলেন– ছবি এঁকে, পোস্টার ও বড় বড় ব্যানার লিখে বাঙালির এই অসহযোগ আন্দোলনকে বেগবান করতে হবে। শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরী ও মুর্তজা বশীরকে যুগ্ম আহবায়ক করে একটি বাস্তবায়ন কমিটি গঠন করা হলো। ১০ দিন ধরে কয়েকশ ছবি ও পোস্টার এঁকে চিত্রশিল্পীরা শহিদমিনার থেকে বিপ্লবী চিত্রের মিছিল বের করলেন, যা ছিল বিশাল এক অভিনব মিছিল। প্রত্যেক শিল্পীর হাতে একটি করে আঁকা চিত্র। আর এসব চিত্রের বিষয় হচ্ছে বাঙালিদের বঞ্চনার ছবি, নির্যাতনের ছবি, বাঙালির সম্পদ লুট করে পশ্চিম-পাকিস্তানের উন্নয়নের ছবি, বাংলার ভাষা, সংস্কৃতির প্রতি আক্রমণ ও অবহেলার ছবি, সেইসঙ্গে পূর্ব-পাকিস্তানের মানুষের প্রতিবাদ ও সংগ্রামের ছবি।

এই বিপ্লবী চিত্রের মিছিলের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল স্বাধীনতা। এই ৪টি অক্ষর বড় বড় করে সুন্দরভাবে লিখে ৪টি মেয়ের গলায় ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছিল মিছিলের অগ্রভাগে থেকে তারা হেঁটে যাচ্ছিল। পাকিস্তানের সামরিক সরকার নানাভাবে ও নানান কৌশলে তখনও আশা দিয়ে যাচ্ছে যে, শেখ মুজিবের সঙ্গে আলোচনায় বসে একটা মীমাংসায় যাওয়া যাবে। কিন্তু শেখ মুজিবুর রহমান ৭ই মার্চ জাতিকে জানিয়ে দিলেন এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। তাই ঘরে-ঘরে দুর্গ গড়ে তুলতে হবে। পাকিস্তানের সৈন্যদের সঙ্গে আমাদের অস্ত্র দিয়েই যুদ্ধ করতে হবে। দেশকে স্বাধীন করতে হবে।

৭ই মার্চের ঘোষণার পর পূর্ব-পাকিস্তানের ঘরে-ঘরে সাড়া পড়ে গেল। নানাভাবে ভবিষ্যৎ কর্মসূচির জন্য প্রস্তুতি চলতে লাগল। কিন্তু প্রকাশ্যে জোরেশোরে কেউ কিছু বলতে পারছিল না। কারণ, তখনও মার্শাল ল বহাল রয়েছে।

চিত্রশিল্পীরা ৭ই মার্চের বক্তৃতা থেকে মূল বিষয়টা বুঝে ফেললেন। তাঁরা আর অপেক্ষা করতে রাজি নয়। তাই শিল্পীরা ছবি ও পোস্টারের মাধ্যমে প্রকাশ্যেই স্বাধীনতাকে বলিষ্ঠভাবে তুলে ধরলেন। মার্শাল ল এর আইন অনুযায়ী এটা রাষ্ট্রদ্রোহিতা। এর জন্য দেখামাত্র গুলি করতে পারে। চিত্রশিল্পীরা মৃত্যু হতে পারে জেনেই এই

মিছিল বের করেছেন। যে চারটি মেয়ে এই চারটি অক্ষর 'স্বাধীনতা বুকে ঝুলিয়ে মিছিলের সামনের দিকে ছিল, এদের তিনজন চারুকলার ছাত্রী আর একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের ছাত্রী। তাঁর নাম সুলতানা কামাল। চারুকলার ছাত্রী সাঈদা কামাল ও ফেরদৌসি পিনুর পরিচিতি চিত্রশিল্পী হিসেবে এবং আরেকজন ছাত্রী সামিনা খাতুন ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ শহিদ হন। এই বিপ্লবী মিছিলের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন। সেদিন তিনিই ছিলেন শিল্পীদের সবচেয়ে বড় সাহস ও শক্তি। রাস্তার দুপাশে হাজার হাজার মানুষের ভিড় জমে গিয়েছিল এই প্রদর্শনী দেখার জন্যে। অনেকেই ছবি বহন করার জন্য সেদিন শিল্পীদের পাশাপাশি হেঁটেছেন। খবর পেয়ে বেগম সুফিয়া কামালও মিছিলে যোগ দিয়েছিলেন। তিনি শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের পাশে থেকে মিছিলের শেষ পর্যন্ত গিয়েছিলেন। মিছিলটি শহিদমিনার থেকে সেগুন বাগিচার তোপখানা রোড হয়ে বর্তমান বঙ্গবন্ধু অ্যাভিনিউ হয়ে নবাবপুর রোড ধরে ভিক্টোরিয়া পার্ক বা বর্তমান বাহাদুর শাহ পার্ক পর্যন্ত গিয়েছিল। পাকিস্তান সরকারের সেনাবাহিনী বা পুলিশবাহিনী মিছিলে বাধা দেওয়ার বা গুলি করার সাহস করেনি।

দলীয় কাজ: অসহযোগ আন্দোলন সম্পর্কে আমাদের শিল্পীদের অবদানের চিত্রগুলো সংগ্রহ করে প্রদর্শন করো।

নমুনা প্রশ্ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। ১৯৪৮ সালে পাকিস্তানের গভর্নর দেশের রাষ্ট্রভাষার ঘোষণা কোথায় দেন?

ক. করাচিতে | খ. পাঞ্জাবে
গ. ঢাকায় | ঘ. সিন্ধুতে

২। চারুকলা ইনস্টিটিউট কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়?

ক. ১৯৪৮ | খ. ১৯৫২
গ. ১৯৬৮ | ঘ. ১৯৬৯

৩। 'দোঁপেয়াজা' কোন শিল্পীর ছদ্মনাম?

ক. কাজী আবদুর রউফ | খ. কাজী আবুল কাশেম
গ. বিজন চৌধুরী | ঘ. মুর্তজা বশীর

৪। শিল্পীরা কেন নবান্ন উৎসবকে শহরে পালন করতে শুরু করে?

ক. সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে টিকিয়ে রাখতে

খ. সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে শহরের পরিবেশে ছড়িয়ে দিতে

গ. আমাদের ঐতিহ্যের প্রতি গর্ববোধে উদ্বুদ্ধ করতে

ঘ. গ্রাম ও শহরের সংস্কৃতির দূরত্ব ঘোচাতে

৫। পাক-শাসকগোষ্ঠী ধর্মের দোহাই দিয়ে বাঙালিদের সংস্কৃতিচর্চায় বাধা দেওয়ার বিরুদ্ধে চিত্রশিল্পীরা সংস্কৃতির কোন বিষয়টিকে প্রতিবাদ হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন?

ক. নবান্ন উৎসব — খ. মঙ্গল শোভাযাত্রা
গ. আলপনা — ঘ. বৈশাখী উৎসব

৬। 'খেলাঘর' কী?

ক. ক্রীড়া প্রতিষ্ঠান — খ. ক্রীড়া সামগ্রীর দোকান
গ. সাংস্কৃতিক সংগঠন — ঘ. শিশু সংগঠন

৭। 'বাংলার মায়েরা মেয়েরা সকলেই মুক্তিযোদ্ধা' শীর্ষক পোস্টারটি কোন শিল্পীর আঁকা?

ক. কামরুল হাসান — খ. দেবদাস চক্রবর্তী
গ. কাইয়ুম চৌধুরী — ঘ. প্রাণেশ মন্ডল

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১। চারু ও কারুকলা ইনস্টিটিউট বা প্রথম গভর্নমেন্ট আর্ট ইনস্টিটিউট কীভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল? প্রতিষ্ঠাতা শিল্পীদের নাম উল্লেখ করে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

২। ২১-এর প্রভাতফেরিতে আলপনা ও পরবর্তী সময়ে আলপনার ব্যবহার বিষয়ে লেখো।

৩। ঢাকা শহরে প্রথম নবান্ন উৎসব বিষয়ে সংক্ষেপে বর্ণনা দাও।

৪। স্বাধীনতা ও বিপ্লবী চিত্রের মিছিল সম্পর্কে লেখো।

৫। পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পার্থক্য লেখো।

৬। চারুকলার পথ যাত্রায় প্রথম একযুগে যে- কয়েকজন চিত্রশিল্পী চারুকলাকে বিকশিত করার জন্য অশেষ অবদান রেখেছেন তাঁদের নাম লেখো।

৭। চিত্রশিল্পীরা কোন কোন রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দলের সঙ্গে যুক্ত থেকে জনগণের দাবি আদায়ে সহযোগিতা করেছেন?

৮। আমাদের সংস্কৃতির গৌরবময় দিকগুলো সম্পর্কে তোমার মতামত ব্যক্ত করো।

৯। বাংলাদেশের অধিকার আদায়ের আন্দোলনে বিভিন্ন সংগঠন ও শিল্পীদের ভূমিকা সংক্ষেপে লেখো।

১০। অসহযোগ আন্দোলনে চিত্রশিল্পীরা যে সকল ছবি এঁকেছিলেন সেগুলোর বিষয়বস্তু উল্লেখ করো।

তৃতীয় অধ্যায়

বিখ্যাত শিল্পী ও শিল্পকর্ম

শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের আঁকা 'বিদ্রোহ'

এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা–

- জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনের কয়েকজন বিখ্যাত শিল্পীর নাম বলতে পারব।
- কয়েকজন বিখ্যাত শিল্পীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতে পারব এবং তাঁদের কয়েকটি শিল্পকর্মের নাম উল্লেখ করতে পারব।

পাঠ : ১

যামিনী রায়

(১৮৮৭–১৯৭২)

শিল্পী যামিনী রায়

বাংলার লোকজ ধারার অন্যতম খ্যাতিমান শিল্পী যামিনী রায়। পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া জেলায় বেলিয়াতোড় নামক গ্রামে ১৮৮৭ সালে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। খুব ছোটবেলা থেকে যামিনী রায়ের মাঝে ছবি আঁকার প্রতি গভীর আকর্ষণ ছিল। ঘরের দেয়াল, মেঝে থেকে শুরু করে হাতের কাছে যা পেতেন তার ওপরই ইচ্ছেমতো হাতি, ঘোড়া, পাখি, বিড়াল, পুতুল যা মনে আসত তা এঁকে আপন মনে রং করতেন।

যামিনী রায় ছবি আঁকার প্রয়োজনীয় রং নানাভাবে নিজেই তৈরি করতেন। নানা বর্ণের মাটি আর গাছগাছালি থেকেও রং আহরণ করতেন।

যামিনী রায় প্রচুর ছবি এঁকেছেন। অল্প বয়সে দেশ-বিদেশে তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়েছিল। নিজ দেশের বাইরে আমেরিকা, লন্ডন, প্যারিস এবং আরও অনেক দেশে তাঁর চিত্রের প্রদর্শনী হয়েছিল। তাঁর অতুলনীয় কাজের মধ্যে মা ও শিশু, কৃষ্ণলীলা, সাঁওতাল, গণেশ, জননী, কীর্তন, দুই নারী ইত্যাদি ছবিগুলো অপূর্ব সৃষ্টি। ৮৫ বছর বয়সে ১৯৭২ সালের ২৪শে এপ্রিল এই মহান শিল্পী পরলোকগমন করেন।

শিল্পী যামিনী রায়ের আঁকা ছবি

পাঠ : ২
পাবলো পিকাসো
(১৮৮১–১৯৭৩)

শিল্পী পাবলো পিকাসো

২৫শে অক্টোবর ১৮৮১ সালে স্পেনের মালাগা শহরে পিকাসোর জন্ম। শিশুকালেই ছবি আঁকার হাতেখড়ি তাঁর বাবার কাছ থেকে। পিকাসোর মধ্যে ছিল ছবির প্রতি গভীর অনুরাগ। তিনি যখন তিন বছরের শিশু, হাতের কাছে পেনসিল কিংবা কাঠকয়লা পেলে কাগজ অথবা মেঝের ওপরেই ছবি আঁকতে আরম্ভ করে দিতেন। তাঁর বিখ্যাত কাজের মধ্যে রয়েছে গুয়ের্নিকা, তিন নর্তকী, দি প্রেসেস, একারেডিওনিস্ট, গার্ল বিফোর মিরর, ইয়ং রেডিজ অত এভিগনন প্রভৃতি। তিনি ভাস্কর্য, কারুশিল্প, মঞ্চসজ্জা, পোশাক পরিকল্পনা, পোস্টার, এচিং, লিথোগ্রাফ, বই-এর অলংকরণ প্রতিটি ক্ষেত্রে ছিলেন অসাধারণ। পিকাসো শুধু শিল্পীই নন, কবিও ছিলেন।

১৯৭৩ সালে ৮ই এপ্রিল, ফ্রান্সে পিকাসোর শিল্পজীবনের চিরসমাপ্তি ঘটে। প্রকৃতপক্ষে পিকাসোর জীবনটাই ছিল এক বিরাট শিল্প। মৃত্যুতেও সে- শিল্পের শেষ হয় না।

পিকাসোর আঁকা 'গুয়ের্নিকা'

পাঠ : ৩

ভিনসেন্ট ভ্যানগগ

(১৮৫৩–১৮৯০)

শিল্পী ভিনসেন্ট ভ্যানগগ-এর আঁকা নিজের ছবি

১৮৫৩ সালের ৩০শে মার্চ হল্যান্ডের ছোট্ট একটি গ্রামে ভ্যানগগ জন্মগ্রহণ করেন। পিতা ছিলেন গ্রাম্য দরিদ্র পাদরি।

সাতাশ বছর বয়সে ভ্যানগগ চিত্রশিল্পীর জীবন বেছে নেবেন বলে স্থির করেন এবং তাঁর ছোটো ভাই থিওকে প্যারিসে চিঠি লেখেন। এর পর থেকে ছোটো ভাইয়ের সাহায্য-সহযোগিতায় ভ্যানগগ অনেক ছবি আঁকেন। কিন্তু জীবদ্দশায় তিনি মাত্র দুখানি ছবি বিক্রি করেছিলেন। ভ্যানগগ মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন একদিন তাঁর ছবির সমাদর হবে। তাঁর সে ধারণা সত্যি হয়েছে। মৃত্যুর পর আজ কোটি কোটি ডলারে তাঁর ছবি বিক্রি হচ্ছে। তাঁর বিখ্যাত ছবিগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য দিনমজুর, আত্মপ্রতিকৃতি, পোস্টম্যান, তাঁতি, একটি গাছ, আলোর দৃশ্য, বাতির রোননদী, সূর্যমুখী ফুল প্রভৃতি। নিজের কুৎসিত মুখশ্রী ও জীবনের প্রতি তীব্র হতাশা তাঁকে ক্রমশ উন্মাদ করে তোলে। মাত্র সাঁইত্রিশ বছর বয়সে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

শিল্পাচার্য নন্দলাল বসু

নন্দলাল বসু

(১৮৮২–১৯৬৬)

শিল্পাচার্য নন্দলাল বসুর জন্ম ১৮৮২ সালে মুঙ্গের খড়গপুরে। তাঁর বাবার নাম পূর্ণচন্দ্র বসু। ছেলেবেলা থেকেই চিত্রকলার প্রতি আকর্ষণ ছিল প্রবল। মাটি দিয়ে দেবদেবীর মূর্তিসহ পুতুল তৈরি করতেন। পরবর্তীকালে তিনি অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাহায্যে কলকাতা আর্ট স্কুলে ভর্তির সুযোগ পান।

১৯০২ সালে ছাত্রাবস্থার শেষ দিকে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আহ্বানে নন্দলাল বসু আর্ট স্কুল ছেড়ে তাঁর সঙ্গে যোগ দেন। সেই সময় তাঁর বোন নিবেদিতার 'হিন্দু-বৌদ্ধ পুরাকাহিনী' বইটির অঙ্গসজ্জা করেন।

১৯১৬ সালে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে বিচিত্রা সংঘ প্রতিষ্ঠা করেন। নন্দলাল বসু সেখানে শিল্পকলার শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন।

শান্তিনিকেতনের দেয়ালচিত্র এঁকে নন্দলাল বসু বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। শেষজীবনে নন্দলাল বসু তুলি-কালি এবং ছাপচিত্রের প্রতি বিশেষ মনোযোগী হন।

তাঁর বিখ্যাত ছবিগুলোর মধ্যে রয়েছে কৈকেয়ী, শিবমতী, সাঁওতালদের শস্যবপন, নৃত্য, হরিপুর দেয়ালচিত্র ইত্যাদি। ১৯৫৪ সালে ভারত সরকার তাকে পদ্মভূষণ উপাধিতে ভূষিত করেন। ১৯৬৬ সালে শান্তিনিকেতনে নন্দলাল বসু পরলোকগমন করেন।

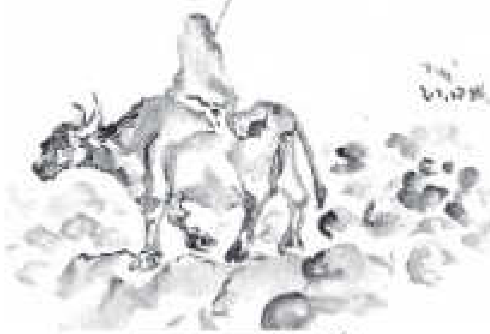

নন্দলাল বসুর আঁকা ছবি

পাঠ : ৪

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(১৮৭১–১৯৫১)

শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কলকাতার বিখ্যাত জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ছেলেবেলা থেকেই ছবি আঁকার প্রতি শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আকর্ষণ ছিল। পিতা গুণেন্দ্রনাথ একসময় আর্ট স্কুলের ছাত্র ছিলেন। পারিবারিক শৌখিন পরিবেশ ও ঘরের দেয়ালে টানানো নানা চিত্রকর্ম পট তাঁর মনকে করেছিল সৃজনশীল ও কল্পনাপ্রবণ।

কলকাতা আর্ট স্কুলের তৎকালীন অধ্যক্ষ হ্যাভেলের চেষ্টায় তিনি সহকারী অধ্যক্ষের পদে যোগ দেন ১৮৯৮ সালে। তারপর ভারতীয় শিল্প আরও ভালোভাবে অনুশীলন করে ১৯০৫ সালে তিনি শিল্পগুরুরূপে জীবন শুরু করেন। তাঁর প্রভাবে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি একটি শিল্পপ্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়।

অবনীন্দ্রনাথের আঁকা 'ক্ষীরের পুতুল' বই এর ছবি

শুধু শিল্পসৃষ্টিই নয়, সাহিত্যেও তাঁর একটা নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি ছিল। তাঁর সাহিত্যকে শিল্পসৃষ্টির পরিপূরক বলে মনে করা হয়।

শিশু ও কিশোরদের জন্য তিনি প্রচুর বই রচনা করেছেন, যেমন– ক্ষীরের পুতুল, ভূত-পেতনীর দেশ, বুড়ো আংলা, ঘুম পাড়ানি দাসী প্রভৃতি। তাঁর উল্লেখযোগ্য চিত্রকর্মের মধ্যে রয়েছে– বুদ্ধ ও সুজাতা, পদ্ম হাতে রাজকুমারী। ১৯৫১ খ্রিষ্টাব্দে এই মহান শিল্পী মৃত্যুবরণ করেন।

চিত্রশিল্পী রবীন্দ্রনাথ

(১৮৬১–১৯৪১)

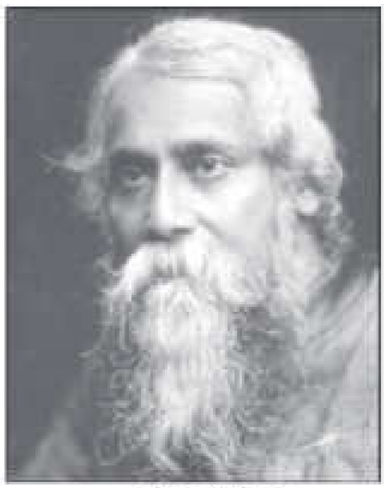

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রবীন্দ্রনাথকে এতদিন আমরা কবিগুরু হিসেবে জেনে এসেছি। আজ আমরা জানব চিত্রশিল্পী রবীন্দ্রনাথকে। কথাটা অনেকটা এভাবে বলা যায়– প্রবীণ বয়সে এসে একজন শিল্পীর মতোই ছবি আঁকতে থাকেন। রবীন্দ্রনাথের ছবি আঁকার পূর্বকথা ও ইতিহাস কোনো আকস্মিক ঘটনা নয়। আঁকার বাসনা তাঁর দীর্ঘদিনের। তা ছাড়া ঠাকুরবাড়িতে বড় ভাই জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, ভ্রাতুষ্পুত্র অবনীন্দ্রনাথ ও গগনেন্দ্রনাথ অনেকেই সে-সময় ছবি এঁকেছেন। ঠাকুরবাড়ির ভেতরে-বাইরে বিচিত্রা সভা ও অন্যান্য সংগঠনের সুবাদে রবীন্দ্রনাথ নিজেও চিত্রচর্চার কাজে খবরদারি করেছেন। তাঁর আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ জীবনস্মৃতি

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আঁকা 'নিজের মুখ'

থেকে জানা যায়, দুপুরবেলা জাজিম-বিছানো কোণের ঘরে ছবি আঁকার খাতা নিয়ে রবীন্দ্রনাথ আঁকাজোকা করেছেন। তিনি বলেছেন, যা চোখের সামনে আছে বা প্রতিদিন আমরা দেখছি তা-ই যথেষ্ট নয়, শিল্পীকে দেখতে হবে একটা বিশেষ কিছু যা তাঁকে সৃষ্টিশীল করবে। শেষ দশ বছরে রবীন্দ্রনাথ অনেক ছবি এঁকেছেন।

সাহিত্যকর্ম করতে গিয়ে কখনো কখনো তিনি শিল্পকর্মের মধ্যে প্রবেশ করেছেন। তার প্রমাণ হিসেবে আমরা দেখতে পাই, অনেক কবিতার মাঝে শব্দ কেটে কেটে তিনি বিচিত্র সব জীবজন্তুর ছবি এঁকে ফেলেছেন। রবীন্দ্রনাথের প্রথম চিত্রপ্রদর্শনী হয় ১৯৩০ সালে জার্মানিসহ ইউরোপের কয়েকটি দেশে। তাঁর কয়েকটি ছবির নাম– নিসর্গ, প্রতিকৃতি, মা ও ছেলে, যুগল, আদিম প্রাণী, নৃত্যরত রমণী, অবসর ইত্যাদি। প্রকৃতিরই বহুচেনা রূপ আমরা দেখি নতুন করে, ভিন্নমাত্রায়-চিত্রশিল্পী রবীন্দ্রনাথের কল্যাণে।

পাঠ : ৫

শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন

(১৯১৪–১৯৭৬)

শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন

শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন ১৯১৪ সালের ২৯শে ডিসেম্বর কিশোরগঞ্জ জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। বাবার নাম তমিজউদ্দিন আহমেদ, মায়ের নাম জয়নাবুন্নেছা। স্কুলের লেখাপড়া শেষ করে ভর্তি হন কলকাতা আর্ট স্কুলে। ভালো ছাত্র হিসেবে অল্প দিনের মধ্যেই সুনাম অর্জন করেন এবং আর্ট স্কুলের শিক্ষা শেষে সেখানেই শিক্ষকতার নিয়োগ পান। তরুণ বয়সেই ছবি আঁকায় প্রচুর খ্যাতি অর্জন করেন জয়নুল আবেদিন। ১৩৫০ সালে বাংলায় প্রচণ্ড দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। তৎকালীন ব্রিটিশ শাসকদের অবহেলা ও অমানবিকতার কারণেই সাধারণ মানুষের খাবারের অভাব হয়েছিল। কলকাতার রাস্তায় হাজার হাজার মানুষের মৃত্যু ও অসহায় অবস্থা তরুণ শিল্পী জয়নুলের মনকে পীড়া দিয়েছিল। ব্রিটিশ শাসকদের প্রতি তাঁর অন্তরে জন্ম নিয়েছিল তীব্র ঘৃণা। মনে মনে ক্ষুব্ধ হয়ে মানুষের মৃত্যু ও দুর্বিসহ অবস্থাকে বিষয় করে আঁকলেন কালো রেখায় অনেক ছবি। যা পরবর্তীকালে দুর্ভিক্ষের চিত্র নামে পরিচিতি হলো। গোটা ভারতসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে শিল্পী জয়নুলের দুর্ভিক্ষের চিত্র নিয়ে নামকরা ব্যক্তিরা পত্র-পত্রিকায় প্রশংসা করে লিখলেন

জয়নুল আবেদিন বাংলার মাটিকে ভালোবাসতেন, ভালোবাসতেন বাংলার মানুষকে। এ কারণে তাঁর শিল্পকর্মে শ্রমজীবী মানুষের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, তাদের জীবন ও যন্ত্রণা, সমাজের বিত্তবানদের দ্বারা লাঞ্ছনা-গঞ্জনা, অত্যাচার-অবিচার ইত্যাদির বাস্তব রূপায়ণ ঘটেছে। বিশেষ করে শ্রমজীবী মানুষের কর্মময় জীবন ও তাদের সংগ্রাম ছিল তাঁর ছবির বিষয়বস্তু।

এ দেশে শিল্পকলা চর্চার জন্য প্রথম যে প্রতিষ্ঠান, তার প্রধান প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রথম অধ্যক্ষ ছিলেন শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন। তিনি বাংলাদেশের নামকরা অনেক শিল্পীকে হাতে ধরে ছবি আঁকা শিখিয়েছেন। শিল্পীদের জন্য কর্মক্ষেত্র তৈরি করেছেন। সমাজকে সুন্দরভাবে চালিত করতে যে শিল্পীদের প্রয়োজন, তা বুঝতে পেরে শিশু-কিশোরদের জন্য ছবি আঁকার স্কুল গড়েছেন। শিল্পকলার ক্ষেত্রে এমন সব অবদানের জন্য বাংলাদেশের মানুষ তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে, তাকে ভালোবেসে নাম দিয়েছে শিল্পাচার্য।

শিল্পাচার্যের শ্রেষ্ঠ শিল্পকর্মগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য–দুর্ভিক্ষের চিত্র ১৯৪৩, সংগ্রাম, গরুর গাড়ি, গুনটানা, সাঁওতাল, প্রসাধন, নবান্ন, মনপুরা-৭০ ইত্যাদি। তাঁর এই অমূল্য চিত্রগুলো সংরক্ষিত রয়েছে ঢাকার জাতীয় জাদুঘরে এবং ময়মনসিংহের জয়নুল সংগ্রহশালায়।

১৯৭৬ সালের ২৮শে মে এই মহান শিল্পী ৬২ বছর বয়সে পরলোকগমন করেন।

পাঠ : ৬

কামরুল হাসান

(১৯২১–১৯৮৮)

শিল্পী কামরুল হাসান

শিল্পী কামরুল হাসান ১৯২১ সালে ভারতের পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। চিত্রকলায় শিক্ষাগ্রহণ করেন কলকাতায়। ১৯৪৭ পরবর্তীকালে তিনি বাংলাদেশে আসেন। শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের সাথে ১৯৪৮ সালে ঢাকার সরকারি চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন এবং এ মহাবিদ্যালয়ে তিনি প্রায় বারো বছর শিক্ষকতা করেন।

বাংলাদেশের ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প কর্পোরেশনের (বিসিক) নকশা কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা শিল্পী কামরুল হাসান। তরুণ বয়সেই ব্রতচারী আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। ১৯৩৯ থেকে ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত এই আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। ব্রতচারী আন্দোলনে খাঁটি বাঙালি হিসেবে গড়ে তোলার জন্য মুকুল ফৌজ গড়ে তোলেন। তিনি ছিলেন মুকুল ফৌজের সর্বাধিনায়ক।

শিল্পী কামরুল হাসানের আঁকা 'উঁকি'

কামরুল হাসানের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কাজ স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় আঁকা ছবি– ইয়াহিয়ার জানোয়ারের মতো মুখ। এটি একটি পোস্টার চিত্র, যার মধ্যে লেখা ছিল 'এই জানোয়ারদের হত্যা করতে হবে'। তাঁর এই পোস্টারচিত্র মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য ছিল উৎসাহ ও প্রেরণার এক অস্ত্র। কামরুল হাসান বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা এবং বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় প্রতীকের নকশা নির্মাণ করে। বাংলাদেশ সরকার তাঁকে একুশে পদকে ভূষিত করেন। সারা জীবন তিনি অনেক উল্লেখযোগ্য কাজ করেছেন। তাঁর বিখ্যাত ছবিগুলো হলো-

নবান্ন, তিনকন্যা, উঁকি, বাংলার রূপ, জেলে, পৈচা, গণহত্যার আগে ও পরে ইত্যাদি। ঢাকার জাতীয় জাদুঘরে তাঁর অনেক ছবি সংরক্ষিত আছে। ১৯৮৮ সালের ২রা ফেব্রুয়ারি কবিদের এক প্রতিবাদী কবিতা সভায় হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে সেই কবিতা মঞ্চে জীবনের শেষ স্কেচ করেছেন, যার শিরোনাম ছিল 'দেশ আজ বিশ্ব বেহায়ার খপ্পরে'।

এস.এম সুলতান

(১৯২৩–১৯৯৪)

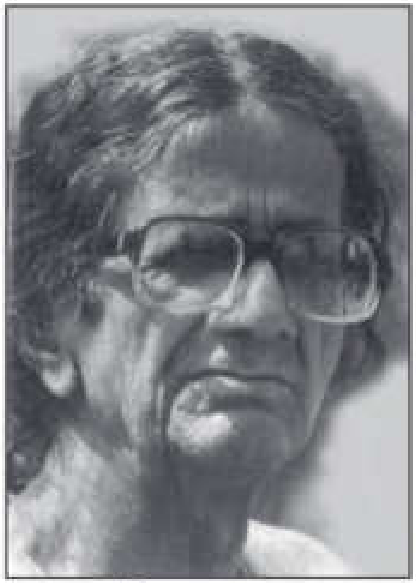

শিল্পী এস.এম সুলতান

শেখ মোহাম্মদ সুলতান (যিনি এস. এম সুলতান নামে পরিচিত) ১৯২৩ সালে তৎকালীন যশোর জেলার নড়াইলের (বর্তমান নড়াইল জেলা) মাছিমদিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর ছেলেবেলা কাটে গ্রামে। মা-বাবা তাঁকে লাল মিয়া বলে ডাকতেন। গ্রামের লোকেরাও তাঁকে এই নামেই ডাকতেন। লেখাপড়ার প্রতি ছিল তাঁর দারুণ অনীহা। আর এ কারণেই তিনি লেখাপড়া থেকে পালিয়ে বাঁচার জন্য কিছু সময় ছবি আঁকা শেখেন কলকাতা আর্ট স্কুলে, তারপর বের হয়ে পড়েন-ঘুরে বেড়ান দেশে-বিদেশে। একজন খেয়ালী মানুষ ও বৈশিষ্ট্যময় চিত্রশিল্পী হিসেবে তিনি খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁর ছবির বিষয় ছিল বাংলাদেশের গ্রাম্যজীবন, চাষবাস, কৃষক, জেলে, খেটে খাওয়া মানুষ। তাঁর ছবির মানুষেরা বলিষ্ঠ ও শক্তিশালী। কৃষককুল জমি কর্ষণ করে ফসল ফলায়, খাদ্য জোগায়। তারাই আসলে দেশের শক্তি, তাদের ভেতরের শক্তিশালী রূপটা তিনি তুলে ধরেছেন।

শিল্পী এস.এম সুলতানের আঁকা 'হালচাষ'

শিশুদের শিক্ষার জন্য বিশেষ ধরনের স্কুল করেন। নাম শিশুস্বর্গ, শিশুরা লেখাপড়া করবে, ছবি আঁকবে, গান গাইবে, প্রকৃতি, গাছপালা, জীব-জন্তুর সাথে আপন হয়ে মিশে যাবে। মনের আনন্দে সব শিখবে, জোর করে নয়। শিল্পী সুলতান অনেক পশু-পাখি পালন করতেন। নিজের সন্তানের মতো সেসব পশু-পাখিকে যত্ন করতেন। শেষ বয়সে নড়াইলে নিজের জন্মস্থানে বসবাস করেন। ১৯৯৪ সালের ১০ই অক্টোবর একাত্তর বছর বয়সে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর বিখ্যাত অনেক শিল্পকর্ম দেশ-বিদেশের চিত্রশালায় সংরক্ষিত আছে। শিল্পকলার ক্ষেত্রে অবদানের জন্য বাংলাদেশ সরকার তাঁকে রেসিডেন্ট আর্টিস্টের সম্মান প্রদান করেন। তিনি স্বাধীনতা ও একুশে পদক লাভ করেন।

নমুনা প্রশ্ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. ১৮৮৭ সালে জন্মগ্রহণ করেন কোন শিল্পী?

(ক) পাবলো পিকাসো (খ) যামিনী রায়

(গ) ভিনসেন্ট ভ্যানগগ (ঘ) নন্দলাল বসু

২. রবীন্দ্রনাথের প্রথম চিত্রপ্রদর্শনী হয় কত সালে?

(ক) ১৯৩৮ (খ) ১৯২২

(গ) ১৯৪১ (ঘ) ১৯৩০ সালে

৩. পাবলো পিকাসো পরলোকগমন করেন−

(ক) ১৯৭৫ সালের ১০ই এপ্রিল (খ) ১৯৭৩ সালের ৮ই এপ্রিল

(গ) ১৯৭২ সালের ১২ই এপ্রিল (ঘ) ১৯৭০ সালের ৯ই এপ্রিল

৪. জীবদ্দশায় ভিনসেন্ট ভ্যানগগের কয়খানা ছবি বিক্রি হয়েছিল?

(ক) পাঁচখানা (খ) দশখানা

(গ) দুখানা (ঘ) বারোখানা

৫. শিশু-কিশোরদের জন্য লেখা- ক্ষীরের পুতুল, বুড়ো আংলা, ঘুম পাড়ানি মাসী- বইগুলো কোন শিল্পীর লেখা?

(ক) যামিনী রায় (খ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(গ) নন্দলাল বসু (ঘ) অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৬. শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন জন্মগ্রহণ করেন কত সালে?

(ক) ১৯১৪ (খ) ১৯১৭

(গ) ১৯১৩ (ঘ) ১৯১৮ সালে

৭. ১৯৪৩ সালে শিল্পাচার্য যে ছবি আঁকেন তার নাম কী?

(ক) সংগ্রাম (খ) গরুর গাড়ি

(গ) দুর্ভিক্ষ (ঘ) নবান্ন

৮. বাংলাদেশের ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প কর্পোরেশনের নকশা কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতার নাম কী?

(ক) জয়নুল আবেদিন (খ) কামরুল হাসান

(গ) আনোয়ারুল হক (ঘ) সফিউদ্দিন আহমেদ।

৯. 'দেশ আজ বিশ্ব বেহায়ার খপ্পরে'– এ স্কেচ কত সালে আঁকা?

(ক) ১৯৯০ (খ) ১৯৮৮

(গ) ১৯৮৬ (ঘ) ১৯৯১ সালে

১০. শিল্পীকে দেখতে হবে একটা বিশেষ কিছু যা তাঁকে সৃষ্টিশীল করবে'– উক্তিটি কার?

(ক) শিল্পী নন্দলাল বসু (খ) শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

(গ) চিত্রশিল্পী রবীন্দ্রনাথ (ঘ) শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন।

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. 'মাত্র সাঁইত্রিশ বছরের জীবনে তিনি পৃথিবীতে রেখে গেছেন অমূল্য সব শিল্পকর্ম'- শিল্পীর নাম উল্লেখ করে তাঁর সম্পর্কে যা জান লেখো।

২. রবীন্দ্রনাথের চিত্রকর্ম সম্পর্কে যতটুকু জেনেছ তা বর্ণনা করো।

৩. পাবলো পিকাসো ছিলেন বহু প্রতিভার অধিকারী– কথাটি বিশ্লেষণ করো।

৪. শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের জীবন ও তাঁর শিল্পকর্ম সম্পর্কে যা জেনেছ তা লেখো।

৫. বাংলাদেশের ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশনের (বিসিক) নকশা কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা শিল্পী কে? তাঁর সম্পর্কে লেখো।

৬. শিল্পী এস. এম সুলতানের জীবন ও তাঁর ছবির বিষয়বস্তু সম্পর্কে বর্ণনা করো।

চতুর্থ অধ্যায়

শিল্পকলা

এ অধ্যায়ে আমরা শিল্পকলার বিস্তৃত জগৎ এবং শিল্পের বিভিন্ন শ্রেণিবিভাগ নিয়ে সংক্ষেপে জানব। বিভিন্ন শিল্পের সাথে চারু ও কারুকলার সম্পর্ক এবং নান্দনিক শিল্প, লোকশিল্প ও কারুশিল্প সম্পর্কে এ অধ্যায়ে বিশেষভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

শিল্পী কামরুল হাসানের আঁকা 'নাইওর'

এ অধ্যায় পড়া শেষ করলে আমরা–

- শিল্পকলা সম্পর্কে সংক্ষেপে বর্ণনা করতে পারব।
- শিল্পকলার বিভিন্ন শ্রেণিবিভাগ উল্লেখ করতে পারব।
- শিল্পকলার বিভিন্ন শাখার সাথে চারু ও কারুকলার সম্পর্ক নির্ণয় করতে পারব।
- নান্দনিক শিল্প, লোকশিল্প ও কারুশিল্প সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারব।
- উল্লেখিত শিল্পগুলোর ব্যবহারিক ক্ষেত্রসমূহের একটি তালিকা তৈরি করতে পারব।

পাঠ : ১

শিল্পকলা সম্পর্কে ধারণা

শিল্পকলার উদ্ভব হয়েছে আজ থেকে হাজার হাজার বছর আগে সেই আদিম মানুষের হাত ধরে। হোমো সাপিয়েন্স মানুষ তার চারপাশে যা দেখেছে, তা-ই শিল্পমাধ্যমে ধরে রাখার চেষ্টা করেছে। হোমো সাপিয়েন্স কথাটার অর্থ হচ্ছে বুদ্ধিমান মানুষ। আজ থেকে ৪০ বা ৫০ হাজার বছর আগে ইউরোপে এই নতুন শিকারি মানুষের আবির্ভাব হয়েছিল। বিভিন্ন শিকারের দৃশ্য ও জীবজন্তুর ছবি তারা সবচেয়ে বেশি এঁকেছে। সেখান থেকেই শিল্পকলার শুরু, তবে এখন শিল্পকলা একটি বিস্তৃত বিষয়। মানুষের মনের সৃজনশীল কর্মকাণ্ডের সামগ্রিক রূপ হচ্ছে শিল্পকলা। শিল্পী তাঁর কল্পনা ও প্রতিভার সাথে দক্ষতা ও রুচির সমন্বয়ে শিল্প সৃষ্টি করেন। শিল্পী তাঁর সৃষ্টির আনন্দ থেকে শিল্প সৃষ্টি করেন বলে কোনো বাঁধাধরা নিয়মের অধীনে শিল্পকে ফেলা যায় না। শিল্পীর কাজ হচ্ছে শিল্পকলার মাধ্যমে আমাদের অন্তর্দৃষ্টিকে সম্প্রসারিত করা, আমাদের কল্পনার পরিধি বাড়িয়ে তোলা।

শিল্পকলার নানা দিক

শিল্পের প্রধান দুটি ধারা হচ্ছে চারুশিল্প (Fine Arts) ও কারুশিল্প (Crafts)। চারুশিল্প শিল্পীর সৃষ্টিশীল মনের একান্ত নিজস্ব সৃষ্টি। এর কোনো ব্যবহারিক প্রয়োজনীয়তা নেই। সৃষ্টির আনন্দে মনের তাগিদ থেকেই তার উৎপত্তি। এটি আমাদের মনে আনন্দ যোগায়, দৃষ্টিকে আনন্দ দেয়। যেমন ধরো একটি সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্যের ছবি দেখে বা কোনো একটি শিল্পকর্ম দেখে তোমার মন ভরে গেল। মন ভালো হলে পড়াশোনাও ভালো লাগবে। মনে আনন্দ নিয়ে পড়তে পারবে। এভাবে চারুশিল্প আমাদের মানসিক প্রয়োজনে কাজে লাগে। আর কারুশিল্প যদিও শিল্প, তবে অনেক ক্ষেত্রেই এর উৎপত্তি জীবিকা অর্জনের তাগিদে এবং মানুষের ব্যবহারিক প্রয়োজন থেকে। সুতরাং বলা যায়, আমাদের মানসিক প্রয়োজন মেটায় যে- শিল্প তা হলো চারুশিল্প বা চারুকলা এবং যে- শিল্প দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহারিক প্রয়োজনে কাজে লাগে, পাশাপাশি মনের আনন্দ জোগায় তা হলো কারুশিল্প বা কারুকলা। সমগ্র শিল্পকলা এই দুটি প্রধান ধারার অন্তর্ভুক্ত। মানুষের সৃষ্টি সমস্ত শ্রেষ্ঠ শিল্পই চারুশিল্পের অন্তর্গত। চারুশিল্পের মধ্যে আছে চিত্রকলা, ভাস্কর্য, খোদাই শিল্প, নৃত্যনাট্য, নাটক, কাব্য, গদ্যসাহিত্য, সংগীত, নৃত্য ইত্যাদি। অন্যদিকে কারুশিল্পের মধ্যে আছে মৃৎশিল্প, বুনন, তাঁত, চর্ম, বাঁশ, বেত, কাঠ ও নানারকম ধাতুর তৈরি ব্যবহারিক শিল্প।

আবার নকশিকাঁথা, নকশি পাখা, খেলনা পুতুল এজাতীয় শিল্পকে আমরা লোকশিল্পের পর্যায়ে ফেললেও এগুলো কারুশিল্পের ধারায় সৃষ্টি। সাধারণ মানুষ মনের আনন্দ নিয়েই এ- সমস্ত শিল্প তৈরি করে। চারুশিল্পের অন্তর্গত প্রতিটি শিল্পই আবার একটি অন্যটির সাথে কোনো-না-কোনোভাবে সম্পর্কিত। এ- বিষয়ক অন্যান্য বইপুস্তকে তোমরা শিল্পকলা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পারবে।

দলীয় কাজ : আমাদের মানসিক বিকাশ ও অন্যান্য প্রয়োজন মেটাতে শিল্পকলা কী ভূমিকা রাখে?

পাঠ : ২

নান্দনিক শিল্প

এই পাঠে আমরা নান্দনিক শিল্প বা চারুশিল্পের অন্তর্গত চিত্রকলা, ভাস্কর্য ও খোদাইশিল্প সম্পর্কে সংক্ষেপে জানব।

পূর্বের পাঠে আমরা চারুকলা সম্পর্কে জেনেছি। নান্দনিক শিল্প আসলে চারুশিল্পেরই অন্য নাম। চারুশিল্প আমাদের মনকে আনন্দ দেয়, দৃষ্টিকে আনন্দ দেয়। যে শিল্প আনন্দদায়ক ও দৃষ্টিনন্দন, যা আমাদের মনের খোরাক যোগায়, তাকেই আমরা নান্দনিক শিল্প বলতে পারি। নন্দন শব্দ থেকে নান্দনিক শব্দের উৎপত্তি। স্বর্গের উদ্যানকে বলা হয় নন্দনকানন। নন্দন শব্দটি সুন্দর অর্থে ব্যবহৃত হয়।

শিল্পী যখন কোনোকিছু সৃষ্টি করেন, তখন তাঁর সৃষ্টির সাথে মিশে থাকে শিল্পীর ব্যক্তিগত জীবনের নানা অভিজ্ঞতা, তাঁর রুচি, চিন্তা-চেতনা, শিল্পবোধ, তাঁর পরিবেশ ও সমাজ ইত্যাদি নানা কিছু। শিল্পী তাঁর আবেগ, আনন্দ, দুঃখ, ক্ষোভ এসব অনুভূতিকেই শিল্পরূপ দেন। দুঃখ-বেদনা থেকেও শিল্পসৃষ্টি হতে পারে। তবে তাতে মিশে থাকে সৃষ্টির আনন্দ। দুঃখকে শিল্পে প্রকাশ করার আনন্দ। এসব শিল্পসৃষ্টির মূলে থাকে শিল্পীর নিজেকে প্রকাশ করার অদম্য ইচ্ছা। শিল্পী চান দর্শক তাঁর শিল্পকর্ম দেখে আনন্দ পাক, শিল্পীর চিন্তাভাবনার সাথে দর্শক নিজের চিন্তার মিল খুঁজে পাক অথবা তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি দর্শকের হৃদয়কে আলোড়িত করুক। দর্শক তাতে চিন্তার কিছু খোরাক পাক। শিল্পী নিজেকে প্রকাশ করার জন্য যে-কোনো মাধ্যম বেছে নিতে পারেন। সেটা হতে পারে চিত্রকলা, ভাস্কর্য বা অন্য কোনো মাধ্যম। চিত্রকলার মতো ভাস্কর্য, কাঠখোদাই বা রিলিফ ওয়ার্ক-এর মাধ্যমেও নান্দনিক শিল্প হতে পারে। মাধ্যম যা-ই হোক এ-ধরনের শিল্পকে আমরা নান্দনিক শিল্প বলতে পারি। যেমন শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের আঁকা ছবি– 'সংগ্রাম'।

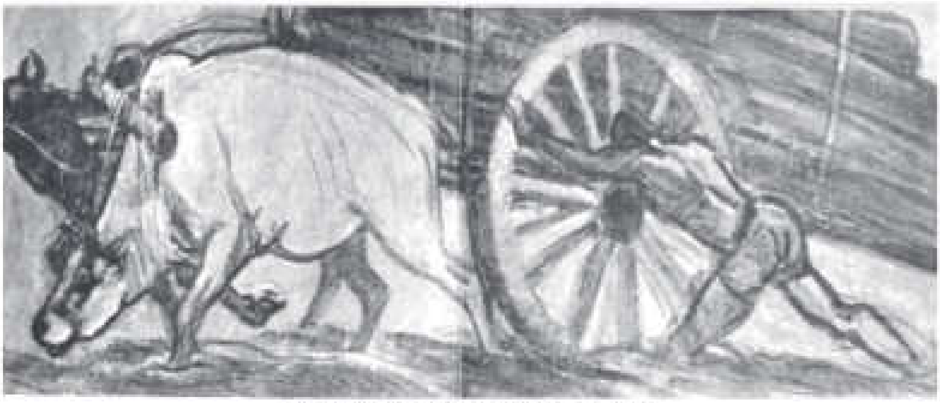

শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের আঁকা– 'সংগ্রাম'

এই ছবিটি শ্রমজীবী মানুষের জীবনসংগ্রামকে তুলে ধরেছে। চিত্রকলার মাধ্যমে যেমন নান্দনিক শিল্প হয়, তেমনি ভাস্কর্যের মাধ্যমেও হতে পারে। আমাদের দেশে ও বিদেশে প্রচুর ভাস্কর্য রয়েছে যা, কোনো বিষয় নিয়ে শিল্পীর মনের অনুভূতিকে মানুষের মাঝে তুলে ধরেছে। যেমন- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবনের সামনে অবস্থিত 'অপরাজেয় বাংলা'। এই ভাস্কর্যটি আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের গৌরবগাঁথা, মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্ব,

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবনের সামনে অবস্থিত ভাস্কর সৈয়দ আব্দুল্লাহ খালিদ-এর তৈরি 'অপরাজেয় বাংলা'

যুদ্ধে নারীর অংশগ্রহণসহ মুক্তিযুদ্ধের অনুভূতিকে প্রকাশ করেছে। একইভাবে কাঠখোদাই বা রিলিফ করা কাজের মাধ্যমেও হতে পারে নান্দনিক শিল্প।

কাজ : ১. চিত্রকলা ও ভাস্কর্যের মাধ্যমে নান্দনিক শিল্প তৈরি করা সম্ভব, এ- বিষয়ে তোমার মতামত তুলে ধরো।
২. যে- কোনো চিত্রকলা বা ভাস্কর্যকে কি আমরা নান্দনিক শিল্প বলব? তোমার মতামত দাও।

পাঠ : ৩

কারুশিল্প

ইতোপূর্বে আমরা চারুশিল্প ও কারুশিল্পের পার্থক্য সম্পর্কে জেনেছি। ব্যবহারিক বস্তুতে সৌন্দর্য আরোপ করার মধ্য দিয়ে কারুশিল্পের সূচনা, আমরা তাও জেনেছি। সকল ব্যবহারিক বস্তুই কারুশিল্প নয়। শুধুমাত্র যেসকল ব্যবহার্য সামগ্রী শিল্পগুণসম্পন্ন অর্থাৎ যা কারুকার্যখচিত অথবা নির্মাণশৈলীর কারণেই মনোমুগ্ধকর, তাকেই আমরা কারুশিল্প বলতে পারি। জীবনের প্রয়োজনে মানুষ যা সৃষ্টি করে তার প্রাথমিক রূপটি হয় খুব সরল। যেমন আমরা যদি আদিমকালের বিভিন্ন হাতিয়ার বা বাসনপত্রের ছবি দেখি, দেখা যাবে সেগুলো খুব সহজ ও সরলভাবে তৈরি। কেবল ব্যবহারিক প্রয়োজনের কারণেই সেটা তৈরি হয়েছে। কিন্তু পরবর্তীকালে সৌন্দর্যবোধ ও রুচিবোধের প্রয়োজনে সে সকল হাতিয়ার বা বাসনপত্রই মানুষ অনেক সুন্দর ও মনোমুগ্ধকরভাবে তৈরি করে তাকে শিল্পরূপ দিয়েছে। তখনই সেটা হয়েছে কারুশিল্প।

পাটের তৈরি কারুশিল্প

মানুষ তার জীবনযাপনকে সুন্দর করার জন্য, সুখে ও আনন্দে বসবাস করার জন্য শিল্পকর্মকে নানাভাবে ব্যবহার করে। গ্রামের সাধারণ গরিব কৃষক বা শ্রমিকও তাঁর কুঁড়েঘরটি বাঁশ, খড় ও ছন দিয়ে যথাসম্ভব সুন্দর করে তৈরি করার চেষ্টা করে। দরজা, জানালায় বাঁশ ও বেতের বাঁধন দিয়ে নানারকম নকশা করার চেষ্টা করে। এর কারণ সব মানুষের মনেই সৌন্দর্যবোধ থাকে। আর সে তার জীবনযাপনে ঐ সৌন্দর্যবোধের

প্রয়োগ করতে চায়। আবার গাঁয়ে যারা অর্থশালী, তাদের বাড়িঘর পরিপাটি করে সাজানো থাকে। কাঠের দরজা, জানালায় থাকে কাঠ খোদাই করা, উঁচু উঁচু হয়ে থাকা নানারকম নকশা, ফুল, পাখি ও লতাপাতার ছবি। তাদের বাড়িতে ব্যবহৃত খাট, পালং, চেয়ার, টেবিল, নানারকম আসবাবপত্র, বেত ও বাঁশের তৈরি বিভিন্ন সামগ্রীতে নানারকম কারুকাজ করে সেগুলোকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করা হয়। শহরের মধ্যবিত্ত বা উচ্চবিত্তরাও কারুশিল্পকে নানাভাবে ব্যবহার করেন তাঁদের জীবনযাপনে। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত বিভিন্ন সামগ্রীর প্রায় সবই কারুশিল্পের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, কারুশিল্প আমাদের সবার জীবনের সাথে ওতপ্রোতভাবে মিশে আছে।

কাজ : তোমার বাসায় বা বাড়িতে ব্যবহৃত হয় এরকম ৫টি কারুশিল্পের নাম লেখো।

পাঠ : ৪

লোকশিল্প

লোকশিল্প মূলত কারুশিল্পের ধারাতেই তৈরি শিল্পকর্ম, যেমন কুমার যখন মাটির হাঁড়ি, কলসি ইত্যাদি বানায়, তখন তা কারুশিল্প। এই হাঁড়ি-পাতিলে রং করে তাতে নকশা বা ছবি এঁকে যখন একে শখের হাঁড়ি বানানো হয়, তখন হয় লোকশিল্প। তবে লোকশিল্পের সাথে কারুশিল্পের পার্থক্য হলো, কারুশিল্প দক্ষ কারিগরের তৈরি এবং তা ব্যবহারিক প্রয়োজন মেটায়। অন্যদিকে লোকশিল্প সাধারণ মানুষের তৈরি শিল্পসামগ্রী। যেমন গ্রামের সাধারণ মেয়েদের তৈরি নকশিকাঁথা। কাঁথায় সুতার ফোঁড়ে অত্যন্ত যত্ন ও আবেগ দিয়ে ফুটিয়ে তোলা হয় ছবিগুলো। নকশিকাঁথার ব্যবহারিক প্রয়োজনীয়তা আছে। আবার মাটি টিপে টিপে যেসব হাতি, ঘোড়া পুতুল ইত্যাদি বানানো হয়, লোকশিল্পে সেগুলোর কোনো ব্যবহারিক প্রয়োজনীয়তা নেই। তাই বলা যায় লোকশিল্পের ব্যবহারিক প্রয়োজনীয়তা থাকতে পারে, আবার নাও থাকতে পারে। গাঁয়ের মেয়েদের তৈরি রঙিন সুতা, পাট বা পাটের রশি দিয়ে বোনা বিভিন্ন শতরঞ্জি, জায়নামাজ, শিকা ইত্যাদি লোকশিল্পের অন্তর্ভুক্ত। লোকশিল্পীদের আঁকা বিভিন্ন পট, সরা ইত্যাদি ছাড়াও নকশি পিঠা, নকশি পাখাসহ বহু লোকশিল্প আমাদের সংস্কৃতিকে উজ্জ্বল করেছে।

কাজ : কারুশিল্প এবং লোকশিল্পের মিল ও অমিল সম্পর্কে ৬টি বাক্য লেখো।

নমুনা প্রশ্ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। মানুষের মনের সৃজনশীল কর্মকাণ্ডের সামগ্রিক রূপ কোনটি?

ক. কারুকলা খ. নৃত্যকলা

গ. শিল্পকলা ঘ. বাস্তুকলা

২। মানুষের সৃষ্টি সমস্ত শ্রেষ্ঠ শিল্প কোনটির অন্তর্গত?

ক. কারুশিল্পের খ. চারুশিল্পের

গ. পোশাকশিল্পের ঘ. লোকশিল্পের

৩। নকশিকাঁথা, খেলনা পুতুল, নকশি পাখা এগুলো কোন শিল্প?

ক. কারুশিল্প খ. লোকশিল্প

গ. ধাতব শিল্প ঘ. দারুশিল্প

৪। নন্দন শব্দটি কী অর্থে ব্যবহৃত হয়?

ক. কুৎসিত অর্থে খ. শৌখিন অর্থে

গ. সুন্দর অর্থে ঘ. সামাজিক অর্থে

৫। জীবনের প্রয়োজনে মানুষ যা তৈরি করে তার প্রাথমিক রূপটি কেমন?

ক. খুব কঠিন খ. খুব সরল

গ. খুব সুন্দর ঘ. খুব জটিল

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১। 'শিল্পকলা' সম্পর্কে সংক্ষেপে লেখো।

২। নান্দনিক শিল্প বলতে কী বোঝায়? এ শিল্প কীভাবে আমাদের অনুভূতিকে নাড়া দেয়?

৩। লোকশিল্প ও কারুশিল্পের পারস্পরিক সম্পর্ক তুলনা করো।

৪। নান্দনিক শিল্প, লোকশিল্প ও কারুশিল্পের ব্যবহারিক ক্ষেত্রগুলো সম্পর্কে সংক্ষেপে লেখো।

৫। দৈনন্দিন জীবনে কারুকলার প্রয়োজনীয়তা সংক্ষেপে আলোচনা করো।

৬। 'অপরাজেয় বাংলা' ভাস্কর্যে মুক্তিযুদ্ধের যে অনুভূতি প্রকাশিত হয়েছে তা লেখো।

পঞ্চম অধ্যায়

ছবি আঁকার বিভিন্ন মাধ্যম ও উপকরণ

যে- কোনো মাধ্যমেই ছবি আঁকা সম্ভব। শুধুমাত্র পেনসিল বা কলম দিয়েও যেমন ছবি আঁকা যায়, তেমনি বিভিন্ন রং, কয়লা এমনকি রঙিন কাগজ কেটে আঠা লাগিয়েও ছবি আঁকা যায়। ইতঃপূর্বে আমরা পেনসিল, কালিকলম, প্যাস্টেল, পোস্টার রং, অ্যাক্রেলিক রং ও জলরং সম্পর্কে জেনেছি। এ - অধ্যায়ে তেলরং, এনামেল রং, প্লাস্টিক রং ও অন্যান্য মাধ্যমগুলো সম্পর্কে জানব।

শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের তেলরঙে আঁকা 'ফসল মাড়াই'

এ অধ্যায় পড়া শেষ করলে আমরা–

- তেলরং ও তার প্রয়োগপদ্ধতি ব্যাখ্যা করতে পারব।
- অক্সাইড রং ও এর ব্যবহার সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারব।
- এনামেল রং ও এর ব্যবহার সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারব।

পাঠ : ১

ছবি আঁকার বিভিন্ন মাধ্যম

ছবি আঁকার বিভিন্ন মাধ্যম সম্পর্কে পূর্ববর্তী শ্রেণিগুলোতে আমরা অনেক কিছু জেনেছি। মাধ্যমগুলোর সাথে আছে বিভিন্ন উপকরণ। যেমন- কাগজ, পেনসিল, কালি-কলম, তুলি, বোর্ড, ক্লিপ, ইজেল, ক্যানভাস ও বিভিন্ন প্রকার রং।

কাগজ ছবি আঁকার জন্য খুবই প্রয়োজনীয় একটি উপকরণ। বিভিন্ন রকম কাগজ পাওয়া যায়। আর মাধ্যম ভেদে কাগজের প্রকারও আলাদা হয়। অর্থাৎ একেক মাধ্যমের জন্য একেক প্রকার কাগজ উপযোগী। পাতলা, মোটা, খসখসে, মসৃণ, সাদা, ধূসর, বাদামি ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকার কাগজে ছবি আঁকা হয়। জলরং, পোস্টার রং, কালি-তুলি, কালি-কলম, প্যাস্টেল বা অ্যাক্রেলিক রঙেও কাগজে ছবি আঁকা যায়।

কাগজে শুধুমাত্র পেনসিল ব্যবহার করে আলো-ছায়া ফুটিয়ে তুলে সাদাকালো ছবি এবং রঙিন পেনসিল ব্যবহার করে রঙিন ছবিও আঁকা সম্ভব।

ছবি আঁকার পেনসিল ও তুলি

পেনসিল 2B, 3B, 4B, 5B এবং 6B সহ বিভিন্ন গ্রেড বা মানের হয়ে থাকে। এ-সমস্ত পেনসিল ব্যবহার করে কাগজে ছবি আঁকা যায়। এ ছাড়াও H গ্রুপের HB, H1, H2, H3 এরকম শক্ত শিসের পেনসিল পাওয়া যায়, সেগুলো ছবি আঁকার পেনসিল নয়।

কালি-কলম দিয়ে মসৃণ কাগজে ছবি আঁকা যায়। আবার কালি-তুলি দিয়েও বিভিন্ন প্রকার কাগজে ছবি আঁকা যায়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর থেকে শুরু করে জয়নুল আবেদিন, কামরুল হাসানসহ বিখ্যাত শিল্পীদের অনেকেই কালি-কলম ও কালি-তুলিতে ছবি এঁকেছেন।

জলরং ও তেলরঙের জন্য একই রকম তুলি ব্যবহার করা হয়না। কালি ও জলরঙে ছবি আঁকার জন্য সাধারণত নরম পশমের তুলি ব্যবহার করা হয়। তেলরং, অক্সাইড রং বা বেশি আঠালো রঙের জন্য অপেক্ষাকৃত শক্ত পশমের তুলি প্রয়োজন। তুলির বিভিন্ন মাপ হয়। সবচেয়ে সরু তুলির নম্বর ০০ (ডবল জিরো) তারপর ০, ১, ২ এভাবে মোটা হতে হতে ২০/২৫ নম্বর পর্যন্ত মানের তুলি পাওয়া যায়। পেনসিল, কাঠকয়লা বা কালিতে সাধারণত সাদাকালো ছবি আঁকা যায়। তবে রঙিন ছবির জন্য রং-ই প্রধান মাধ্যম বা উপকরণ।

রং বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। যেমন- প্যাস্টেল রং, জলরং, অ্যাক্রেলিক রং, পোস্টার রং, প্লাস্টিক রং, এনামেল রং, তেলরং, রঙিন অক্সাইড ইত্যাদি। পূর্ববর্তী শ্রেণিতে আমরা বিভিন্ন রং সম্পর্কে জেনেছি। এ- অধ্যায়ে আমরা তেলরং, এনামেল রং, প্লাস্টিক রং ও রঙিন অক্সাইড সম্পর্কে সংক্ষেপে জানব।

তেলরং

নাম শুনেই বোঝা যায়, এটি তেল মাধ্যমের রং, অর্থাৎ এ- রঙের সাথে তেলের সম্পর্ক আছে। তেলরঙের সাথে তিশির তেল মিশিয়ে ছবি আঁকতে হয় এবং তরল করার জন্য তারপিন মেশাতে হয়। পৃথিবীর বড় বড় শিল্পীরা তেলরং মাধ্যমে ছবি এঁকেছেন এবং সেসব কালজয়ী ছবির মাধ্যমে তাঁরা শিল্পী হিসেবে অমর হয়ে আছেন। বাংলাদেশসহ সারা বিশ্বের শিল্পীদের অন্যতম প্রিয় মাধ্যম হচ্ছে তেলরং। তেলরং -এর ছবির বৈশিষ্ট্য এই যে, তা শত শত বছর ধরে টিকে থাকে এবং সঠিক পরিচর্যা করলে রঙের উজ্জ্বলতা হারায় না। বাস্তবভিত্তিক ছবি

আঁকার ক্ষেত্রে এ রং তুলনাহীন। তবে সব ধরনের ছবির জন্যই তেলরং উপযোগী মাধ্যম। সাধারণত টিউব আকারে ছোটো-বড়ো বিভিন্ন সাইজে তেলরং পাওয়া যায়। তেলরং -এর জন্য শক্ত পশমের বিভিন্ন মাপের তুলি পাওয়া যায়। তেলরঙে ছবি আঁকার জন্য রং ছাড়াও তারপিন, তিশিতেল এবং রং গোলানের জন্য একটুকরো হার্ডবোর্ড, প্লাইবোর্ড বা কাচার প্লেট প্রয়োজন। সাধারণত ক্যানভাসে (কাঠের ফ্রেমে আটকানো শক্ত কাপড়) তেলরঙের ছবি আঁকা হয়। তবে হার্ডবোর্ড, প্লাইবোর্ড বা কাঠের ওপরও তেলরঙে আঁকা সম্ভব। এমনকি শক্ত মোটা কাগজেও তেলরং ব্যবহার করা যায়। তবে এখন তেলরঙের জন্য আলাদা কাগজ তৈরি হয়।

ব্যবহারবিধি

তেলরং যদি ক্যানভাসে ব্যবহার করা হয়, তবে প্রথমেই ক্যানভাসকে আঁকার উপযোগী করে নিতে হয়। সাদা ক্যানভাস কাপড় প্রয়োজনমতো মাপে কাঠের ফ্রেমে চারদিকে তারকাটা দিয়ে টানটান করে আটকে নিতে হয়। তারপর সাদা জিংক অক্সাইড ও আইকা গাম মিশিয়ে পেস্ট তৈরি করে ক্যানভাসে ভালোভাবে লেপন করতে হয়, যাতে কাপড়ের ছিদ্রগুলো বন্ধ হয়ে যায়। এরপর রং শুকালে ক্যানভাস টানটান, মসৃণ এবং ছবি আঁকার উপযোগী হয়ে ওঠে। তখন এতে ছবি আঁকা হয়। তেলরঙে ছবি আঁকার জন্য যে-কোনো রং ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রথমে গাঢ় রং থেকে ক্রমশ হালকা বা লাইট রঙে যেতে হয়। অর্থাৎ বিষয়কে ফুটিয়ে তোলার জন্য তার গভীর ছায়া বা গাঢ় বর্ণটি প্রথমে প্রয়োগ করতে হয়। তারপর সেখান থেকে হালকা রং প্রয়োগ করে লাইট বের করতে হয়। তেল শুকাতে সময় লাগে বলে একটি রঙের উপর অন্য রং প্রয়োগের জন্য অপেক্ষা করতে হয়। রং শুকালে পুনরায় কাজ করা যায়। এ- কারণে তেলরঙে ছবি আঁকতে অনেক সময়ের প্রয়োজন হয়। রঙের সাথে পরিমাণমতো তিশিতেল এবং তরল করার জন্য তারপিন তেল মেশাতে হয়।

এনামেল রং

এনামেল রংও তেল মাধ্যমের রং। এনামেল রঙের-এর সাথে তারপিন মিশিয়ে তরল করা যায়। এ-রং সাধারণত টিন, লোহা, হার্ডবোর্ড, প্লাস্টারের দেয়াল ইত্যাদিতে ব্যবহার করা হয়। তা ছাড়া বাঁশ, কাঠেও ব্যবহার করা যায়। তবে এনামেল রং দিয়ে হার্ডবোর্ড, কাপড়, টিন, কাঠ ইত্যাদির উপরও ছবি আঁকা যায়। রিকশার পিছনে আমরা যে-ছবি দেখি, যেগুলো রিকশা পেইন্টিং হিসেবে পরিচিত, তা এনামেল রঙে আঁকা হয়। আমাদের দেশে সাধারণত সাইনবোর্ড ও অন্যান্য প্রচারমাধ্যমের কাজে এই রং ব্যবহার করা হয়। এই রং ছোটো-বড়ো বিভিন্ন আকৃতিতে কৌটায় সংরক্ষিত অবস্থায় বাজারে পাওয়া যায়।

রঙিন অক্সাইড ও প্লাস্টিক রং

রঙিন অক্সাইড ও প্লাস্টিক রং মূলত আঠা ও রং-এর সাথে পানি মিশিয়ে তৈরি হয়। প্লাস্টিক রং বিভিন্ন শেডে কৌটায় পাওয়া যায়। সাধারণত পাকা ভবনের দেয়ালে এই রং ব্যবহার করা হয়। তবে এ- রং দিয়ে কাপড়ে বা শক্ত বোর্ডে ছবি আঁকা সম্ভব। অন্যদিকে বিভিন্ন রঙিন অক্সাইড পাউডার হিসেবে বাজারে পাওয়া যায়। তার সাথে পরিমাণমতো আইকা গাম ও পানি মিশিয়ে ছবি আঁকা যায়।

ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে আমরা বিভিন্ন রং ও এর ব্যবহারবিধি সম্পর্কে জানলাম। বাস্তবক্ষেত্রে এর প্রয়োগের মাধ্যমেই এসমস্ত রং সম্পর্কে আমরা সম্পূর্ণরূপে ধারণা লাভ করতে পারব।

নমুনা প্রশ্ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। ছবি আঁকার উপযোগী পেনসিল কোনটি?

ক. 1B খ. HB

গ. 4B ঘ. H

২। জলরঙে ছবি আঁকতে কোন ধরনের পশমের তুলি প্রয়োজন?

ক. নরম খ. শক্ত

গ. মোটা ঘ. মিশ্র

৩। কালি-কলমে ছবি আঁকার উপযোগী কাগজ কোনটি?

ক. হ্যান্ডমেড কাগজ খ. মসৃণ কাগজ

খ. নিউজপ্রিন্ট কাগজ ঘ. বক্সবোর্ড

৪। তেলরঙ মাধ্যমে কোন ধরনের তেল ব্যবহার করা হয়?

ক. কেরোসিন তেল খ. তিশি তেল

গ. সরিষার তেল গ. নারিকেল তেল

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. তেলরং সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করো।

২. তেলরং-এর ব্যবহারবিধি বর্ণনা করো।

৩. এনামেল রং সম্পর্কে লেখো।

৪. রঙিন অক্সাইড ও প্লাস্টিক রং সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করো।

৫. ছবি আঁকার অন্যতম প্রধান উপকরণ কাগজ সম্পর্কে সংক্ষেপে লেখো।

৬. ছবি আঁকার জন্য কী কী ধরনের তুলি ব্যবহার করা হয়, বিস্তারিত লেখো।

ষষ্ঠ অধ্যায়

বিষয়ভিত্তিক ছবি ও নকশা অঙ্কন

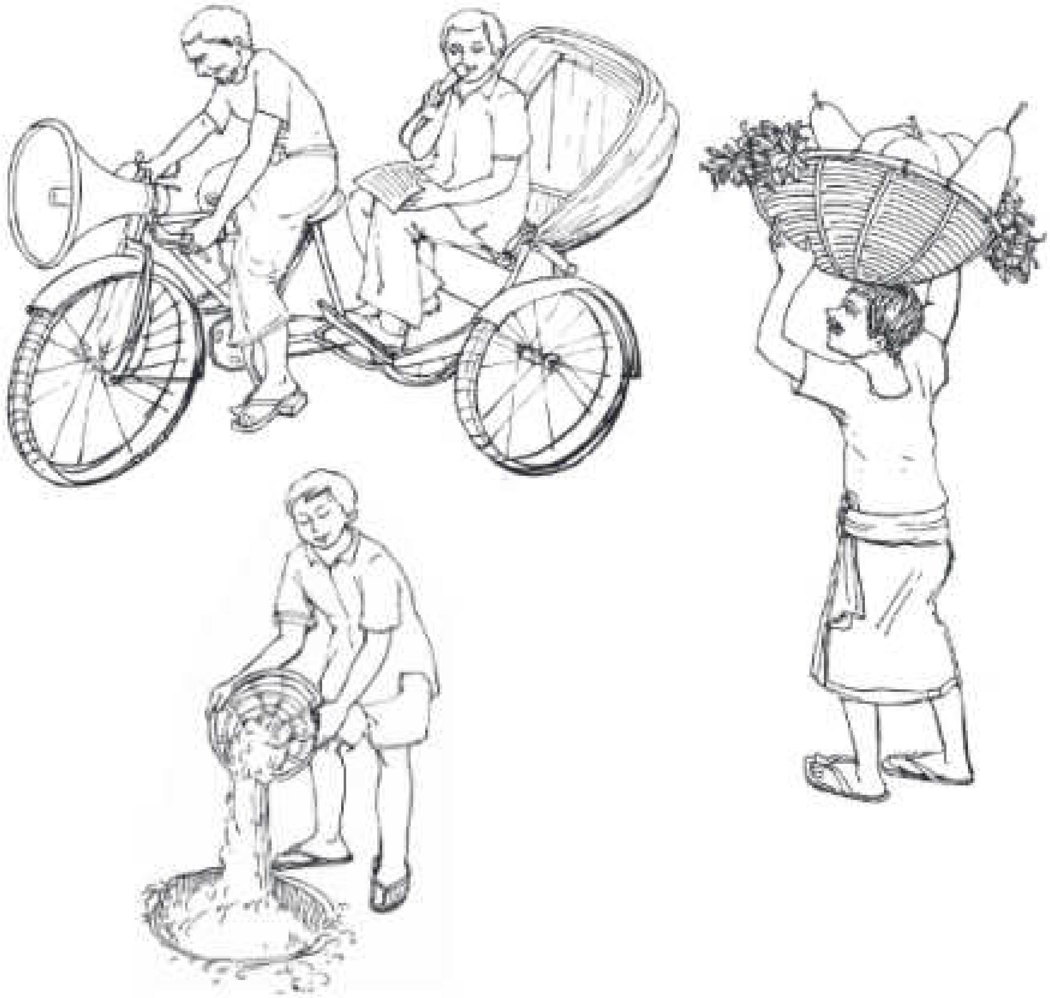

এ অধ্যায় পড়া শেষ করলে আমরা –

- মানুষ ও বিভিন্ন প্রাণীর ছবি আঁকার সাধারণ নিয়মগুলো বর্ণনা করতে পারব।
- সুন্দর ও সাবলীলভাবে মানুষ ও বিভিন্ন প্রাণীর ছবি আঁকতে পারব।
- বিভিন্ন বিষয়ে ছবি ও নকশা আঁকতে পারব।

ছবি যা নিয়ে আঁকা হয়, সেটাই ছবির বিষয়। তবে বিষয়ভিত্তিক ছবি বলতে আমরা বুঝি, কোনো বিশেষ বিষয়কে বা ঘটনাকে নিয়ে আমরা যখন ছবি আঁকি। যেমন– বিষয় হতে পারে প্রাকৃতিক দৃশ্য, ষড়ঋতুর কোনো একটি অথবা মুক্তিযুদ্ধ, বিজয় দিবস, শহিদ দিবস কিংবা বাংলা নববর্ষ, বৈশাখী মেলা ইত্যাদি। বিষয়ভিত্তিক ছবি আঁকার পূর্বে সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্পর্কে বা ঐ ঘটনা সম্পর্কে আঁকিয়ের সুস্পষ্ট ধারণা থাকতে হবে। তাই শুরুতেই বিষয়কে ভালোভাবে বুঝে নিয়ে ছবি আঁকতে হবে। আমাদের চারপাশের প্রকৃতি ও পরিবেশকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করতে হবে। ঋতুর পরিবর্তনে বদলে যাওয়া প্রকৃতি ও মানুষের জীবনাচার আগ্রহ নিয়ে লক্ষ করতে হবে।

কর্মরত মানুষের অনুশীলন

আমাদের চারদিকে প্রতিদিন কত রকমের কর্মরত মানুষ দেখি। কুলি, মজুর, রিকশাওয়ালা, ঠেলাওয়ালা, ফেরিওয়ালা আরও অনেক কর্মরত মানুষ। রোদে পুড়ে, বৃষ্টিতে ভিজে আরও নানা রকমের প্রাকৃতিক প্রতিকূলতায় তাদের জীবনযাপন করতে হয়। সেসব কর্মরত মানুষের নানারকম প্রকাশভঙ্গি, তাদের গতিময় পথচলাকে গভীরভাবে দেখে আঁকব। এইসব কর্মরত মানুষের ছবি সকলের সামনে তুলে ধরে তাদের কষ্টসাধ্য জীবনের কথা জানাতে পারব।

মানুষ ও বিভিন্ন প্রাণীর ছবি আঁকার অনুশীলন

পাশের চিত্রগুলোতে আমরা কী দেখছি? কতগুলো রেখার আঁচড়ে আঁকা মানুষের নানা ভঙ্গিমার গতিময় রূপ। আরও দেখা যাচ্ছে, মানুষের চলাফেরা কিংবা দৌড়ানোর সময় তার শরীরের মধ্যে হাড়ের কাঠামোটির কী পরিবর্তন হয়। এই অবস্থাগুলো যখন আমরা বেশি বেশি পর্যবেক্ষণ করব, তখন হাড়ের এই কাঠামোর উপর মাংসের স্তর দিলেই ছবির আসল রূপ ফুটে উঠবে।

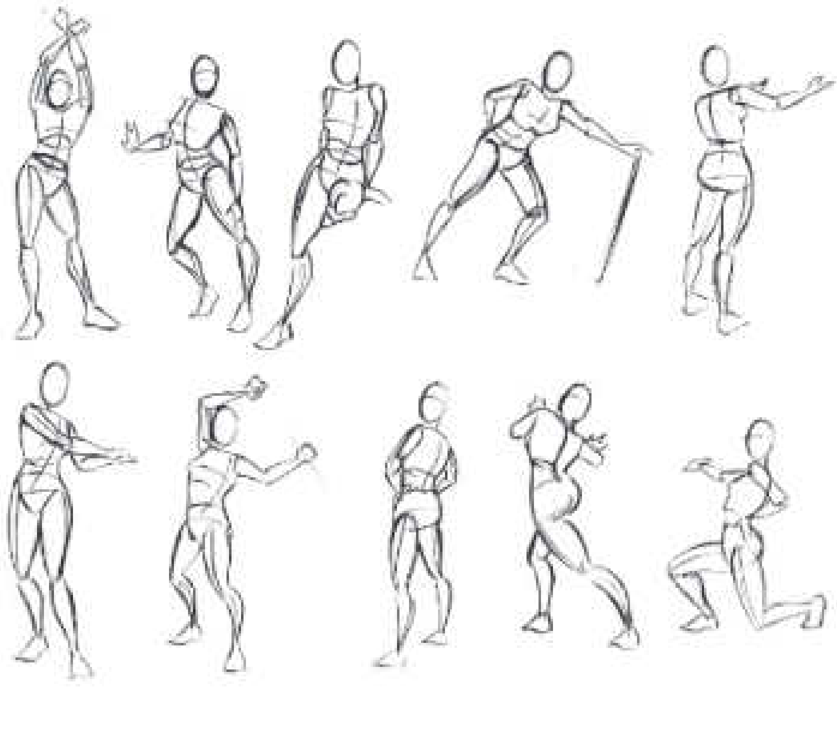

চলমান অথবা গতিময় বিষয়বস্তুর চিত্রাঙ্কনে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব রেখা টানতে হয়। এক্ষেত্রে প্রয়োজন দ্রুত

গতির রেখা। আবার স্থির বিষয়ের ক্ষেত্রে প্রয়োজন ধীরগতির। নিচের চিত্রের মতো মডেল বা কোনো ব্যক্তিকে বসিয়ে ধীরগতির রেখা দিয়ে আঁকতে হবে।

বিভিন্ন প্রাণী আঁকার অনুশীলন

মানুষের ছবি আঁকা আয়ত্তে এলে অন্যান্য প্রাণীর চিত্র অঙ্কনে আমাদের বিশেষ বেগ পেতে হবে না। ঐ সকল প্রাণীর গতিবিধি ও আকার-আকৃতি, প্রকৃতি জেনে বিভিন্ন অবস্থায় ভালো করে পর্যবেক্ষণ করে আঁকতে অভ্যস্ত হলে একটা সময় যেসকল প্রাণী সাধারণত আমরা সব সময় দেখি, তা আঁকতে পারব।

নিচে কয়েকটি প্রাণীর রেখাচিত্র দেখানো হলো- যা আমাদের প্রাণীর ছবি আঁকতে সহায়তা করবে।

কাজ : তোমার দেখা একজন কর্মরত মানুষের ছবি এবং তার পারিপার্শ্বিক পরিবেশ তুলে ধরে একটি চিত্র অঙ্কন করো।

কাজ : তিনটি ভিন্ন ভিন্ন ভঙ্গিতে তিনজন মানুষের চিত্র অঙ্কন করো।

নকশা আঁকার অনুশীলন

ষষ্ঠ শ্রেণিতে আমরা নকশা অঙ্কনে ত্রিভুজ, চতুর্ভুজ, বৃত্ত ইত্যাদির ব্যবহার করেছি। সপ্তম শ্রেণিতে নকশা অঙ্কনে ব্যবহার করেছিলাম ফুল-পাখি, লতা-পাতা ইত্যাদি। অষ্টম শ্রেণিতে আমরা এই দুইয়ের সমন্বয় করে নকশা আঁকব। আমরা তো ইতিমধ্যে জেনেছি নকশা আঁকার কোনো ধরাবাঁধা নিয়ম নেই। মনের ইচ্ছেগুলোকে কখনো নির্দিষ্ট মাপে আবার কখনো বা মাপ ছাড়াই সাজিয়ে মজার মজার নকশা আমরা আঁকতে পারব। তবে নকশা অঙ্কনের যেমন স্বাধীনতা আছে, তেমনি কোন নকশা কোন জায়গায় আঁকলে বা সাজালে সেই জিনিসের সৌন্দর্য আরও বাড়বে, সে বিষয়ে আমাদের একটু গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করতে হবে।

দৈনন্দিন জীবনে এমন কোনো ক্ষেত্র নেই, যেখানে নকশার ব্যবহার নেই। আমাদের পোশাকে, শাড়ি, জামা, পাঞ্জাবি, চাদর, ছোটো ছেলে-মেয়েদের জামা-কাপড়ে রং-বেরঙের নকশার ছড়াছড়ি। ঘরবাড়ি, আসবাবপত্র, হাঁড়ি-পাতিল, থালা-বাটি, খাবার-দাবার, পিঠা সর্বত্রই যেন নকশার আয়োজন।

ফুল, লতা-পাতা দিয়ে নকশা

বই-পুস্তক, পত্র-পত্রিকা, প্রচারপত্র, মানপত্র, জন্মদিন, বিয়ে ও নানারকম অনুষ্ঠানে নকশাকে আমরা বিভিন্নভাবে কাজে লাগাচ্ছি।

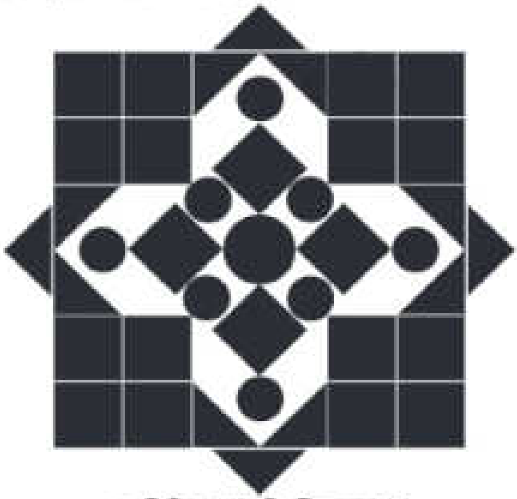

জ্যামিতিক আকৃতি দিয়ে নকশা

এ ছাড়াও নকশিকাঁথায়, শীতলপাটিতে, জায়নামাজে, শখের হাঁড়িতে, আলপনায় নকশাধর্মী ছবি ব্যবহার করে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়।

সুন্দর নকশা ও উজ্জ্বল রঙের কারণে বিভিন্ন বস্তু বা সামগ্রী মনকে আকৃষ্ট করে। এ সকল বাহারি নকশায় যেমন আমাদের মনের প্রফুল্লতার প্রকাশ ঘটে, তেমনি সৃজনশীল চিন্তার বিকাশ ঘটে।

নমুনা প্রশ্ন

ব্যবহারিক প্রশ্ন

১। বৃত্ত, ত্রিভুজ ও চতুর্ভুজ ব্যবহার করে ৫"X ৫" মাপে একটি নকশা এঁকে সাদা-কালো রং করো।

২। ফুল, লতা-পাতার সমন্বয়ে ৬"X ৬" মাপে একটি নকশা তৈরি কর। সাদা-কালো রং করো।

৩। তোমার চেনাজানা দুটি পোষা প্রাণীর ছবি অঙ্কন করো।

৪। কর্মরত মানুষের তিনটি প্রকাশভঙ্গি এঁকে দেখাও।

৫। প্রাকৃতিক ফর্ম (ফুল, লতা-পাতা, পাখি) ব্যবহার করে ৬"X ৪" মাপে একটি সাদা-কালো নকশা অঙ্কন করো।

৬। তোমার প্রিয় ঋতুর একটি ছবি আঁক এবং রং করো।

৭। মুক্তিযুদ্ধ অথবা ভাষা আন্দোলনকে বিষয় করে একটি ছবি এঁকে যে কোনো মাধ্যমে রং করো।

৮। বাংলাদেশের যে কোনো একটি উৎসবের ছবি এঁকে রং করো।

৯। তোমার দেখা একটি গ্রামবাংলার দৃশ্য এঁকে রং করো।

১০। নদী ও নৌকাকে বিষয় করে একটি দৃশ্য অঙ্কন করে রং করো।

সপ্তম অধ্যায়

বিভিন্ন মাধ্যমের শিল্পকর্ম

এ অধ্যায় শেষে আমরা –

- বোর্ড ও কাগজ দিয়ে কয়েকটি শিল্পকর্ম তৈরি করতে পারব।
- কাঠের জিনিস তৈরি করার কিছু হাতিয়ারের ব্যবহার করতে পারব।
- কাঠ দিয়ে ধীরে ধীরে পুতুল তৈরি করতে পারব।
- কাঠের ঘোড়া তৈরি করতে পারব।
- কাঠ কেটে নকশা তৈরি করতে পারব।
- মাটির কাজ করার ছোটোখাটো হাতিয়ার ব্যবহার করতে পারব।
- মাটির কয়েল, ফুলদানি, পুতুল ও বিভিন্ন রকম কারুশিল্প তৈরি করতে পারব।
- মাটির কয়েল দিয়ে পাত্র তৈরি করতে পারব।
- মাটির ফলকে চিত্র ও নকশা তৈরি করতে পারব।
- বেল বা কদবেলের খোলস দিয়ে পুতুল তৈরি করতে পারব।
- পালক দিয়ে ফুল তৈরি করতে পারব।
- নিজেদের কল্পনাশক্তি খাটিয়ে অন্যান্য জিনিসও তৈরি করতে পারব।
- পালকের তৈরি ফুল দিয়ে ঘর সাজাতে এবং উপহার দিতে পারব।
- ফেলনা উল বা পাট দিয়ে হাঁসের ছানা তৈরি করতে পারব।

পাঠ : ১

কাগজ ও বোর্ড কাগজ দিয়ে শিল্পকর্ম

জীবনযাত্রার প্রয়োজনে প্রতিদিন কতভাবে যে আমরা কাগজ ব্যবহার করছি, তা বলে শেষ করা যাবে না। কাগজকে সভ্যতার বাহন বললে ভুল হবে না। পড়ালেখার বইখাতা থেকে শুরু করে মুদির দোকানের ঠোঙা পর্যন্ত দৈনন্দিন জীবনের হাজারো প্রয়োজনে কাগজ ব্যবহৃত হয়। আমরা ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণিতে কাগজ দিয়ে কিছু শিল্পকর্ম করতে শিখেছি। এবার কিছু ব্যবহার্য জিনিস তৈরি করা এবং কাগজের সাথে সম্পর্কিত কিছু কাজ শিখব। কাজগুলো শিখলে তা নিজের ব্যক্তিগত প্রয়োজনে তো লাগবেই, পাশাপাশি সৃজনশীলতাও বৃদ্ধি পাবে। বিভিন্ন কাজে আমরা বিভিন্ন রকম কাগজ ব্যবহার করি। যেমন– ইনভেলাপ তৈরির জন্য সাধারণ লেখার কাগজ বা অফসেট পেপার, আবার বই-খাতা বাঁধাই করার জন্য শক্ত কাগজ, বোর্ড কাগজ, পিচবোর্ড ইত্যাদি এবং অ্যালবাম তৈরির জন্য ধূসর রঙের শক্ত বোর্ড কাগজ, পিচবোর্ড, নকশা-করা মার্বেল কাগজ ইত্যাদি। কী ধরনের কাগজ ব্যবহার করা হবে তা প্রয়োজন অনুযায়ী বেছে নেব। আসল কথা হলো কোন পদ্ধতিতে কোন জিনিস তৈরি করা যায় তা জেনে নেওয়া।

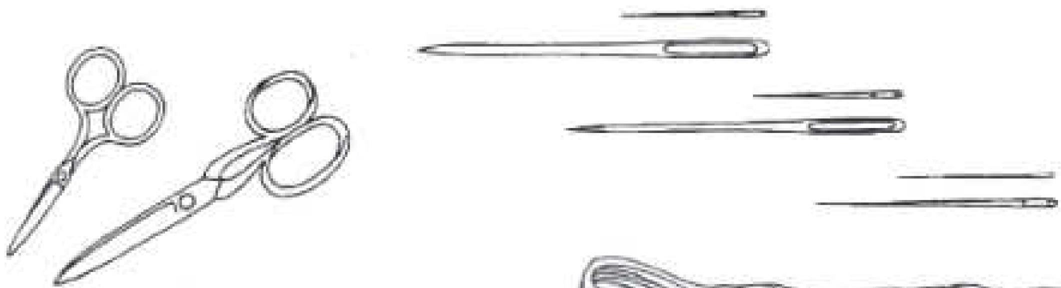

পাঠ : ২, ৩, ৪ ও ৫

বোর্ড কাগজ দিয়ে বিভিন্ন শিল্পকর্ম

শক্ত সাদা কাগজে পাখি, মাছ বা যে-কোনো জীবজন্তুর ছবি এঁকে কেটে নিই। ছবির উভয় পাশে রং করি। এবার ছবিগুলোর উপরদিকটায় লম্বা সুতো দিয়ে আটকিয়ে নিই।

চার-পাঁচটি ছবি কাঠির মাথায় সুতোর কাঠিগুলো আড়াআড়ি ধরে শক্ত সুতো বা তার দিয়ে বেঁধে দিই। উপরের দিকটা ধরার সুবিধার জন্য সুতা লম্বা রাখি।

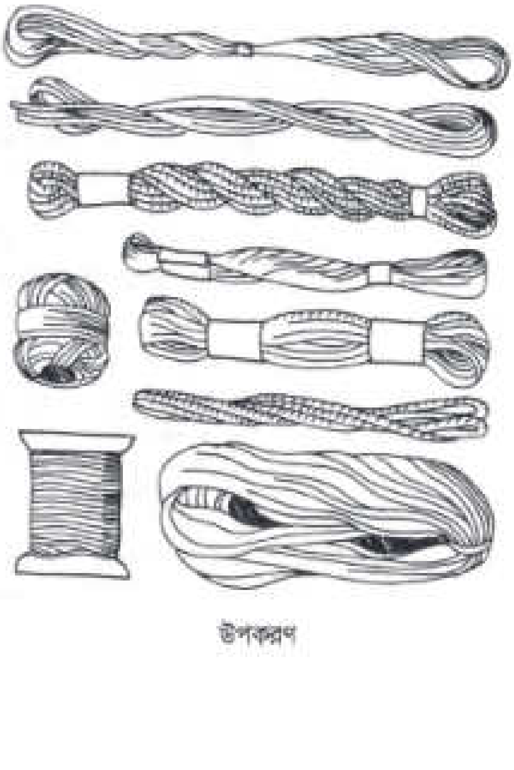

উপকরণ

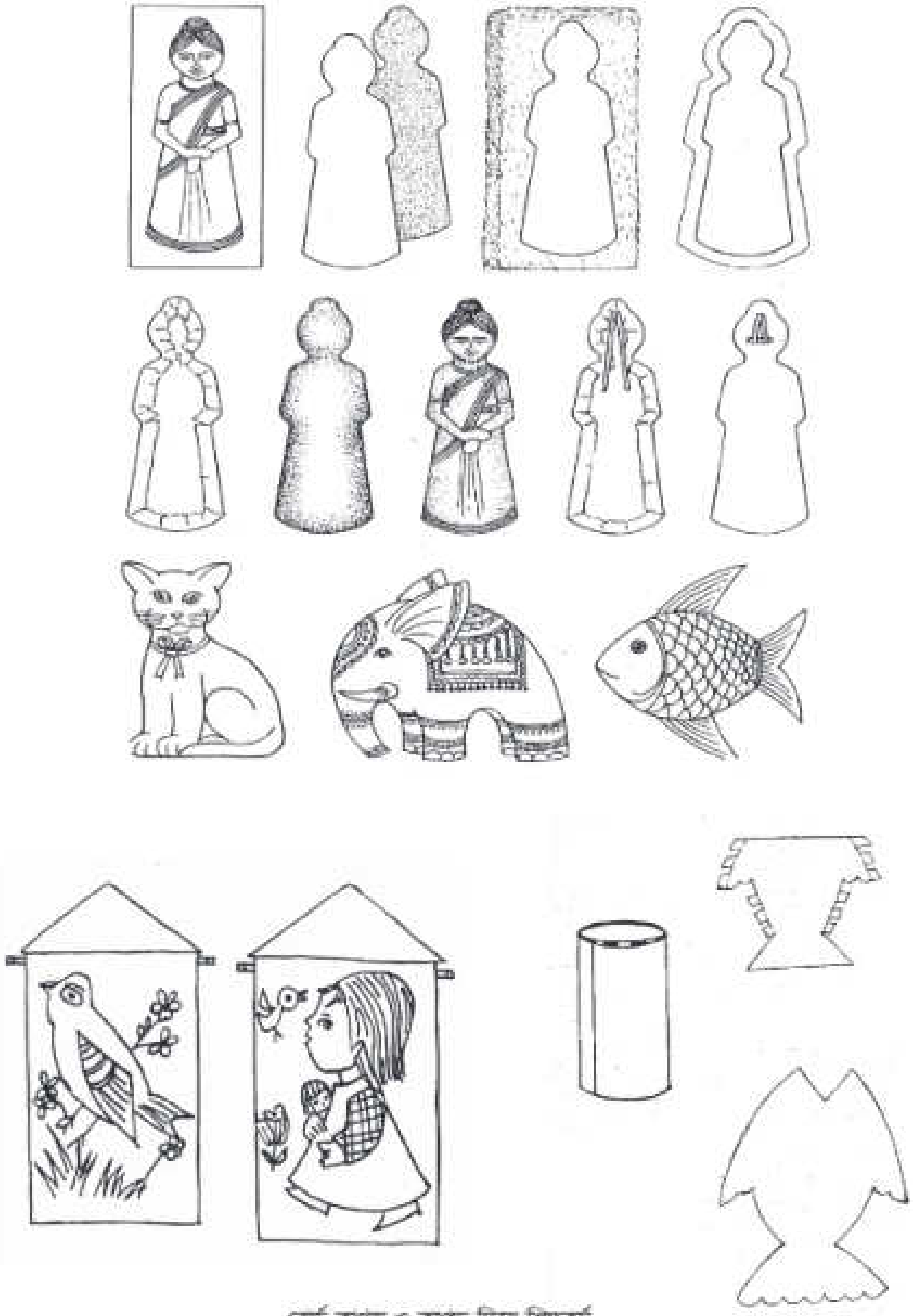

বোর্ড কাগজ ও কাপড় দিয়ে শিল্পকর্ম

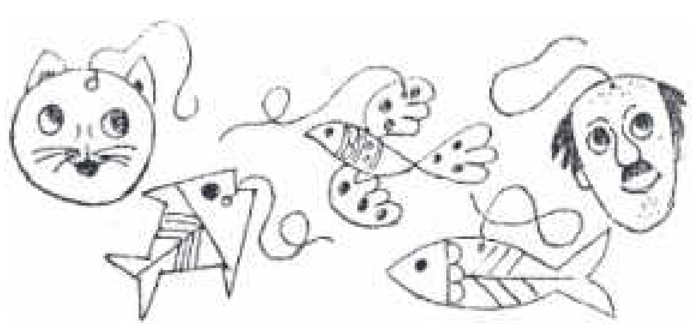

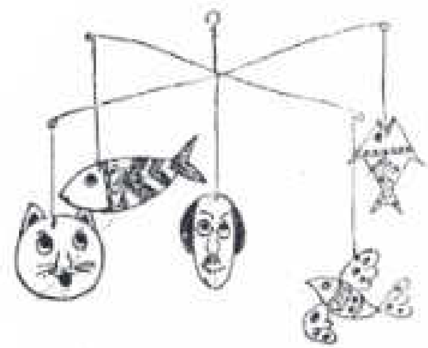

বোর্ড কাগজ দিয়ে মজাদার খেলনাগুলো ছবি দেখে তৈরি করি

পাঠ : ৬

কাঠের তৈরি শিল্পকর্ম

প্রাচীনকাল থেকেই আমাদের দেশে কাঠ দিয়ে বিভিন্ন ধরনের শিল্পকর্ম তৈরি হয়ে আসছে। পোড়ামাটির ফলকচিত্রের মাধ্যমে আমরা যেমন আমাদের প্রাচীন শিল্পকর্মের নিদর্শন পাই, ঠিক তেমনি পাই কাঠের মূর্তি, কারুকার্যখচিত স্তম্ভ, থাম, তোরণ, দরজা, আসবাবপত্র ও অন্যান্য ব্যবহারিক জিনিসে। আমাদের জাতীয় জাদুঘর ও অন্যান্য স্থানীয় ঐতিহাসিক জাদুঘরে এরকম অনেক নিদর্শন আছে। যে-কোনো মেলায় গেলেই আমরা কাঠের তৈরি হরেক রকমের পুতুল, হাতি, ঘোড়া ইত্যাদি নানা প্রকার খেলনা দেখতে পাই। এক সময় আমরাও হয়তো এরকম কিছু কাঠের তৈরি খেলনা তৈরি করতে পারব, যেগুলো দিয়ে খেলা করতে খুবই মজা পাই। যদি নিজের হাতে কাঠ দিয়ে এমনি একটি পুতুল, খেলনা কিংবা অন্য কোনো সুন্দর জিনিস তৈরি করতে পারি তাহলে খুব আনন্দ হবে। এবার কাঠ, বাঁশ দিয়ে বিভিন্ন জিনিস তৈরি করার পদ্ধতি জেনে নিই। প্রাথমিক পর্যায়ে কাঠের পুতুল, পশুপাখি ইত্যাদি তৈরি করার জন্য খুব নরম কাঠই সবচেয়ে উপযোগী। নরম কাঠ সহজেই নিজের ইচ্ছেমতো কাটতে পারব। আমাদের দেশে সহজে ও কম দামে যেসব কাঠ পাওয়া যায়, তার মধ্যে শিমুল ও কদম কাঠই সবচেয়ে নরম ও সুলভ। তাই পুতুলের জন্য শিমুল কিংবা কদম কাঠ জোগাড় করি। কিছু-কিছু কাজের জন্য 'প্লাই-উড' (Ply-Wood) ব্যবহার করতে হবে। 'প্লাই-উড' হলো পাতলা পাতলা কাঠ একটির ওপর আরেকটি বসিয়ে জোড়া দিয়ে তৈরি করা তক্তা।

উপকরণ

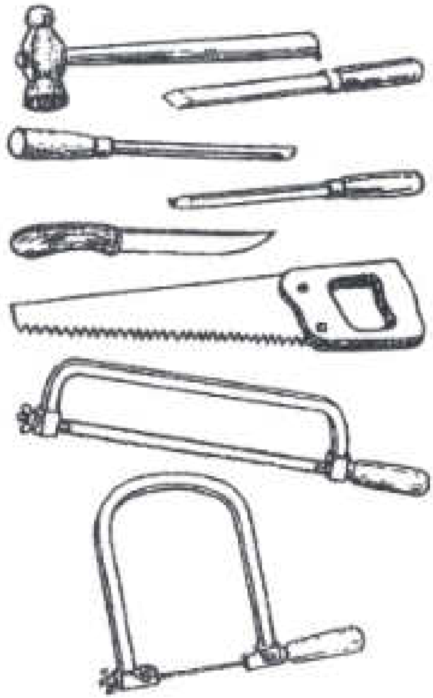

কাঠের জিনিস তৈরি করার কিছু হাতিয়ার

কাঠের শিল্পকর্মের জন্য কাঠই যে প্রধান উপকরণ তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এবার যেসব কাজ করব তার জন্য শিমুল ও কদম কিংবা এরকম নরম কোনো কাঠ, 'প্লাই-উড' পেলিগাম কিংবা আইকা আঠা, শিরীষ কাগজ, ভাঙা কাচের টুকরো, চাইনিজ লেকার কিংবা এনামেল রং ইত্যাদি থাকা জরুরি। এছাড়া হাতুড়ি, বিভিন্ন ধরনের বাটালি, ধারালো শক্ত ছুরি, হাত করা, লোহা কাটার করাত 'হ্যাক-স্য' (Hack-saw) ফ্রেট-স্য' (Frat Saw) স্কেল, তুলি ইত্যাদি হাতের কাছে রাখা উচিৎ। 'ফ্রেট-স্য' হলো পাতলা কাঠে নকশা নির্মাণের জন্য ফ্রেমে আঁটা অতি সরু করাত বিশেষ।

পাঠ : ৭

কাঠের পুতুল

কাঠ দিয়ে প্রথমে খুব সহজ একটা পুতুল তৈরি করি। ঝুড়ি মাথায় একটি নারী। এই পুতুলের জন্য ৩ সেমি. পুরু, ৩ সেমি. চওড়া ও ১৫ সেমি. লম্বা এক টুকরো নরম কাঠ নিই। কদম কিংবা শিমুল কাঠ এরকম কাজে খুব উপযোগী। ধারালো বাটালি দিয়ে ঠেলে ঠেলে প্রথমে কাঠের শির চারটি মেরে দিই। এবার খুব সাবধানে আস্তে আস্তে কেটে যাই, যতক্ষণ না কাঠের টুকরোটি সরু রুলারের মতো আগাগোড়া সমানভাবে গোল হয়ে যায়। গোল করে কাটার পর কাঠের টুকরোটির ব্যাস হলো মোটামুটি ৩ সেমি. আর লম্বা রইল ১৫ সেমি.। স্কেল দিয়ে প্রথমে ঠিক সাড়ে সাত সেন্টিমিটার মেপে কাঠের চারপাশ ঘুরিয়ে দাগ দিই। দাগের ওপরে নিচে দুপাশেই সাড়ে সাত সেন্টিমিটার করে কাঠটি দুভাগ হয়ে গেল। এবার মাঝের দাগ থেকে ওপরের দিকে প্রথমে সাড়ে তিন সেন্টিমিটার তারপর আর আড়াই সেন্টিমিটার মেপে চারদিক ঘুরিয়ে দাগ দিই। দেখি, পেনসিলের দাগ দিয়ে কাঠটি মোট চারভাগে ভাগ হয়ে গেল। প্রথম ভাগে দেড় সেন্টিমিটার এবং চতুর্থ ভাগে সাড়ে সাত সেন্টিমিটার। লোহা কাটার করাত বা 'হ্যাক-স্য' দিয়ে পেনসিলের সব কয়টি দাগ বরাবর কাঠের চারদিকে ঘুরিয়ে সামান্য গভীর করে কাটি। কাটার গভীরতা যেন চারদিকেই সমান হয়। ছবিটি ভালো করে লক্ষ করি এবং ছবিতে প্রদর্শিত নিদর্শন অনুযায়ী ধারালো বাটালি দিয়ে ঠেলে কাঠের চারদিক ঘুরিয়ে খাঁজ কাটি। খাঁজ কাটার জন্য প্রয়োজন হলে ধারালো ছুরিও ব্যবহার করতে পারি। সব কয়টি খাঁজ কাটা হয়ে গেলে মোটামুটিভাবে একটি পুতুলের আদল এসে গেছে। ঝুড়ি মাথায় কোনো নারীর মতো। শিরীষ কাগজ দিয়ে ঘষে পুতুলটিকে মসৃণ করি। মসৃণ করার পর ঝেড়ে-মুছে পুতুলটিকে পরিষ্কার করে নিই, যাতে এর গায়ে কাঠের কোনো কণা বা ধুলা লেগে না থাকে। ছুতোর মিস্ত্রির কুঁদন যন্ত্র (Turning implement) ব্যবহার করে এরকম একটি পুতুল পাঁচ-ছয় মিনিটের মধ্যেই তৈরি করা যায়। ভবিষ্যতে কোনোদিন এই যন্ত্রের ব্যবহার শিখতে পারলে খুব সহজে অল্প সময়ে এরকম অনেক কিছু তৈরি করতে পারব।

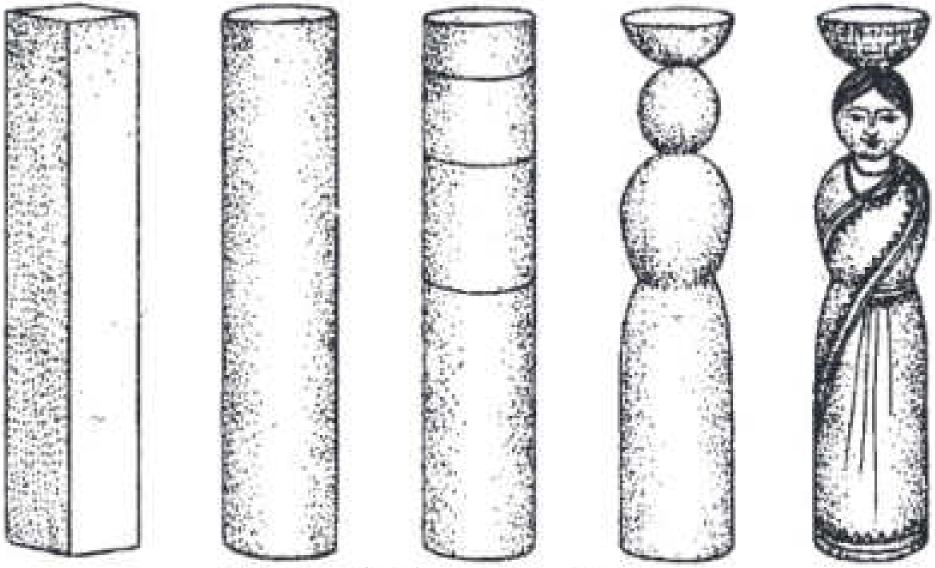

কাঠখণ্ড থেকে ধীরে ধীরে পুতুলের রূপ দেয়া হয়েছে

এবার পুতুলটি রং করার পালা। কী কী রং লাগাব পুতুলের গায়ে? পুতুলের মুখে ও শরীরে হালকা হলুদ রং, শাড়ির জন্য লাল রং, শাড়িতে সাদা রঙের নকশা আর কালো ও সাদা রং মিলিয়ে পাড়। তারপর কালো রং দিয়ে চুল, নাক ও চোখ, লাল রং দিয়ে ঠোঁট আর বাদামি রঙের ঝুড়ি। পরে আরও কিছু পুতুল তৈরি করে আমাদের পছন্দমতো বিভিন্ন রং লাগাতে পারব। সবুজ শাড়ি, নীল শাড়ি, বেগুনি শাড়ি কতরকম রং যে লাগানো যাবে! অন্য কোনো রং লাগাবার আগে পুতুলের সারা শরীরে হালকা হলুদ রং লাগিয়ে ভালো করে শুকিয়ে নেবার পর শাড়ি, চুল ও চোখ-মুখের রং দেব। রং করার জন্য মোটা ও সরু দুরকমের তুলি ব্যবহার করব। মোটা তুলি দিয়ে ঝুড়ি, চুল, মুখ, শরীর ও শাড়িতে রং লাগানোর পর সরু তুলি দিয়ে নাক, চোখ, ঠোঁট, শাড়ির পাড় ও নকশা আর ঝুড়ির বুনন আঁকব। সরু তুলি দিয়ে সব কাজ করতে গেলে রং সমানভাবে লাগবে না। কৌটার চাইনিজ লেকার বা এনামেল রং বেশি ঘন হলে সামান্য তারপিন মিশিয়ে একটু পাতলা করে নেব, কিন্তু বেশি পাতলা করব না। রং করা শেষ হলে দেখব সুন্দর একটা পুতুল তৈরি হয়েছে।

পাঠ : ৮

কাঠের ঘোড়া

পুতুল ও পাখির মতো খুব সহজেই একটি ঘোড়া তৈরির চেষ্টা করি। ঘোড়ার জন্য ২ সেমি. পুরু, ১০ সেমি. চওড়া ও ১৬ সেমি. লম্বা এক টুকরো নরম কাঠ নিই। কাঠের দুপিঠ ঘষে মসৃণ করি। কাঠের সমান মাপের কাগজের ওপর ছবি দেখে অনুরূপ একটি ঘোড়ার ছবি আঁকি। কার্বন কাগজ দিয়ে কাঠের ওপর ঘোড়ার ছবির ছাপ তুলি। ছাপের রেখা বরাবর 'ফ্রেট-স' দিয়ে কেটে ঘোড়াটি আলাদা করে ফেলি। ছবিতে ঘোড়ার নির্মাণ-কৌশলের পর্যায়গুলো ক্রমানুসারে দেখানো হয়েছে। ক্রমান্বয়ে এক - একটি পর্যায়ের ছবি মন দিয়ে দেখি এবং তা অনুসরণ করে প্রয়োজনমতো সোজা ও বাঁকা মুখের বাটালি দিয়ে ঠেলে ঠেলে একটু একটু করে কেটে কিছুটা গোলাকৃতি করি। তারপর ঘোড়ার কেশরের অংশটি দুপিঠ থেকে কেটে কেটে পাতলা করে আধা

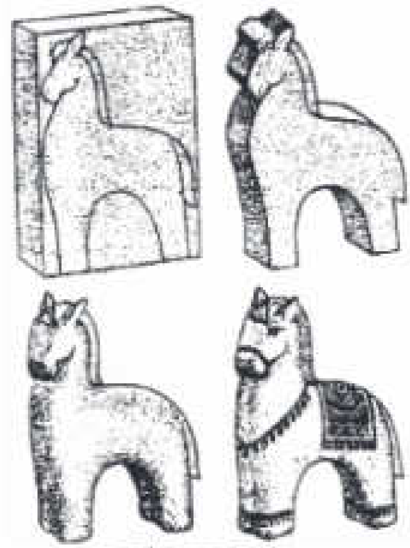

কাঠের ঘোড়া তৈরি

সেন্টিমিটারের কাছাকাছি নিয়ে আসি। কান দুটি বাদ দিয়ে কেশর পাতলা করব। লেজের অংশটি কেটে পাতলা করে এক সেন্টিমিটারে করব। মাথার কপালের দিকটা পুরু থাকবে কিন্তু মুখের দিকটা কিছু পাতলা হয়ে যাবে। মুখের নিচে গলার দিকটা মুখের থেকে সামান্য পাতলা ও কিছুটা গোলাকৃতি করি। সামনের দুটি পা বোঝাবার জন্য পায়ের অংশের দুপিঠে সামান্য খাঁজ কেটে দিই। পেছনের পা দুটির জন্যও তা-ই করি।

কান দুটির মাঝখানটা কেশরের সীমারেখা পর্যন্ত সামান্য কেটে আলাদা করে দিই। যখনই যেখানে কাটব দুপিঠ থেকে সমানভাবে কাটব, তাহলে ঘোড়া যে পাশ থেকেই দেখি না কেন দুপাশ সমান দেখব। ১ সেমি. পুরু, ৫ সেমি. চওড়া ও ১১ সেমি. লম্বা এক টুকরো কাঠের ওপর চারপাশে সমান জায়গা ছেড়ে ঘোড়াটিকে দাঁড় করিয়ে নিচ দিক থেকে সামনের ও পেছনের পা বরাবার সরু তারকাটা মেরে আটকিয়ে দিই। এখন ঘোড়াটিকে যেখানেই রাখি না কেন সামান্য নড়াচড়াতেও পড়ে যাবে না। শিরীষ কাগজ দিয়ে ঘষে ঘোড়াটিকে মসৃণ করে চাইনিজ লেকার কিংবা এনামেল রং দিয়ে পছন্দমতো রং করে নিই।

পাঠ : ৯

কাঠের নকশা

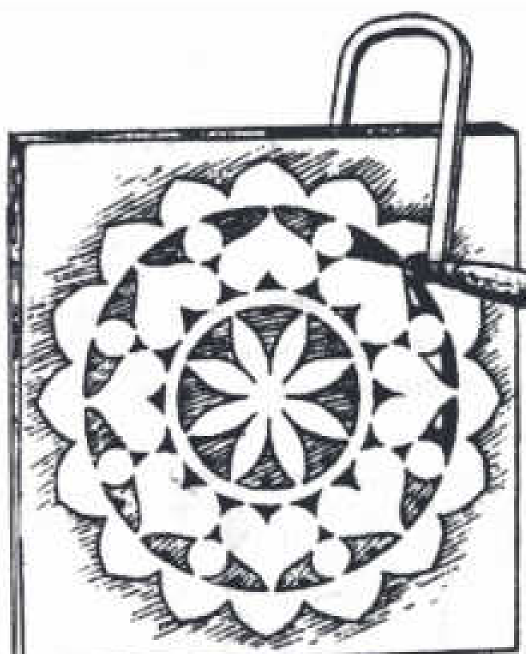

কাঠ কেটে নকশা তৈরি

কাঠ কেটে তৈরিকৃত নকশা বিভিন্নভাবে ব্যবহার করা যায়। একবার নকশা কাটার কৌশলটা আয়ত্ত করতে পারলে তা প্রয়োগ করে হরেক রকম জিনিস তৈরি করতে পারব। নকশা কেটে যেমন ঘরের সাজসজ্জার জিনিস তৈরি করতে পারব তেমনি আসবাবপত্র, দরজার প্যানেল ও অন্যান্য ব্যবহার্য জিনিসের শোভাবর্ধনের কাজেও ব্যবহার করতে পারব।

কাঠ কেটে নকশা তৈরি করার আগে নকশাটি কাগজে এঁকে নিতে হবে। যত বড়ো নকশা তৈরি করতে চাই, ঠিক তত বড়ো করে পছন্দমতো একটি নকশা আঁকি। প্রথম প্রথম একটু মোটা ধরনের নকশা দিয়ে কাজ আরম্ভ করি। কাজের কৌশল আয়ত্ত করার পর ক্রমে ক্রমে অনেক সূক্ষ্ম নকশাও তৈরি করতে পারব। নকশার ভেতরের ও বাইরের অপ্রয়োজনীয় কাঠ কেটে ফেলে দিয়ে নকশা তৈরি করতে হবে। অসাবধানতাবশত যাতে নকশার কাঠ কাটা না পড়ে, তার জন্য নকশার ভেতরের অপ্রয়োজনীয় এলাকা পেনসিল বা বলপেনের রেখা দিয়ে ভর্তি করে দিলে অপ্রয়োজনীয় অংশ সহজে চোখে পড়বে, ভুল হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে না।

নকশা কাটার জন্য তিন বা চার পরতের ভালো প্লাইউড অথবা মোটামুটিভাবে আধা সেন্টিমিটার পুরু ভালো নরম কাঠ নিই। শিরীষ কাগজ দিয়ে ঘষে কাঠের দুপিঠ সামান্য মসৃণ করি। কার্বন কাগজ বসিয়ে কাঠের ওপর কাগজে আঁকা নকশার ছাপ তুলি। বলপেনের রেখা দিয়ে ভর্তি করে নকশার ভেতরের অপ্রয়োজনীয় এলাকা চিহ্নিত করি। সরু তুরপুন দিয়ে অপ্রয়োজনীয় এলাকার প্রত্যেকটিতে এর সীমারেখার খুব কাছাকাছি জায়গায় 'ফ্রেট-স্য' ঢোকাবার জন্য একটি করে ছিদ্র করে নিই। আয়োজন সবই শেষ হলো। এবার নকশা কাটার পালা।

শিল্পকলা শিক্ষকদের কাছ থেকে 'ফ্রেট-স্য' ব্যবহার করার নিয়ম ভালো করে জেনে নেব। 'ফ্রেট-স্য' খুব পাতলা কাঠে নকশা নির্মাণের জন্য ফ্রেমে আঁটা অতি সরু করাত বিশেষ। ফ্রেমে আঁটা করাতটি ফ্রেম থেকে খোলা যায়, আবার ফ্রেমে আটকানো যায়, খুব টান করা যায়, একটু ঢিলেও করা যায়।

দুপাশে কান লাগানো নাট ঘুরিয়ে এসব করা যায়। এবার নকশা কাটতে চেষ্টা করি। করাতের সামনের মাথা ফ্রেম থেকে আলগা করে কাঠের অপ্রয়োজনীয় এলাকার একটি ছিদ্রের ভেতর দিয়ে ঢুকিয়ে মাথাটি আবার ফ্রেমে আটকিয়ে নিই। নাট ঘুরিয়ে করাতটি যথাসম্ভব টান করে নিই। মাত্রাতিরিক্ত টান করতে গেলে করাত ছিঁড়ে যেতে পারে, আবার ঢিলে থাকলে কাঠ কাটার সময় ভেঙে যেতে পারে। তাই খুব সাবধানে কাজ করব। এবার অপ্রয়োজনীয় এলাকার সীমারেখা বরাবর 'ফ্রেট-স্য' চালিয়ে অপ্রয়োজনীয় অংশটি কেটে আলাদা করে ফেলি। একটি অংশ কাটা শেষ হলে করাতের মাথা ফ্রেম থেকে আলগা করে করাতটি বের করে আনি এবং আরেকটি অপ্রয়োজনীয় অংশের ছিদ্র দিয়ে ঢুকিয়ে আটকিয়ে নিই। এভাবে প্রত্যেকটি অপ্রয়োজনীয় অংশ কাটার পর নকশার বাইরের সীমারেখা বরাবর 'ফ্রেট-স্য' চালিয়ে পুরু নকশাটি কেটে বের করে ফেলি। নকশা তৈরি হলো। এবার শিরীষ কাগজ দিয়ে ঘষে অমসৃণ জায়গাগুলো ও একটি পিঠ ভালোভাবে মসৃণ করে নিই। কাঠের রং বজায় রেখে স্বচ্ছ বার্নিশের প্রলেপ দিয়ে নিই। নকশাটি গৃহ সজ্জার কাজে বা আসবাবপত্রের শোভাবর্ধনের জন্য ব্যবহার করা যাবে।

পাঠ : ১০

মাটির তৈরি শিল্পকর্ম

মাটির তৈরি জিনিস আমরা সব সময়ই দেখি। দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহারও করি। মাটির হাঁড়ি-পাতিল, সরা, গামলা, কলস, সোরাই, খোরা, সানকি, চাড়ি, মটকি ইত্যাদি অসংখ্য জিনিস আমাদের বিভিন্ন প্রয়োজনে যুগ যুগ ধরে ব্যবহার হয়ে আসছে। সভ্যতার আদিযুগ থেকে মানুষ মাটির পাত্র ও বিভিন্ন জিনিস তৈরি করতে শিখেছে। সেগুলোর গঠন ও গড়নপদ্ধতি অবশ্যই ছিল আদিম ধরনের। যুগ যুগ ধরে মানুষ পুরুষানুক্রমিক অর্জিত জ্ঞান, বুদ্ধি, সৌন্দর্যবোধ ও কলাকৌশল কাজে লাগিয়ে মাটির শিল্পকর্মের রূপ সেই আদিম এবড়ো-খেবড়ো অবস্থা থেকে বর্তমান অবস্থায় নিয়ে এসেছে। আজকাল আমরা চীনামাটির তৈরি যেসব সুন্দর সুন্দর জিনিসপত্র ও বাসন-কোসন ব্যবহার করি তা আসলে মাটি দিয়েই তৈরি। সেগুলো অবশ্য নিখুঁত বিশুদ্ধ সাদা মাটি, যার মধ্যে মাটির মৌলিক উপাদান ছাড়া অন্য কোনো উপাদান বা ভেজাল নেই। মাটি সম্পর্কে পরে আমরা অনেক কিছুই জানতে পারব। মানুষ আদিমকাল থেকে এ পর্যন্ত মাথা খাটিয়ে মাটির জিনিস তৈরি করার যতরকম কলাকৌশল আবিষ্কার করেছে, তার মধ্যে চাকার ব্যবহার সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ। মাটির পাত্র তৈরি করার ক্ষেত্রে কুমারের চাকা যে কী প্রচণ্ড গতি সঞ্চার করেছে, একটু চিন্তা করলেই তা বুঝতে পারব। ইতোমধ্যে কয়েল পদ্ধতিতে আমরা মাটির পাত্র তৈরি করতে শিখেছি। এভাবে একটি পাত্র তৈরি করতে আমাদের প্রায় সারাদিন লেগে যায়।

কুমাররা কিন্তু চাকা ঘুরিয়ে ঐ সময়ে এরকম কয়েকশো পাত্র তৈরি করতে পারে। কুমারবাড়ি গেলে দেখতে পারব চোখের নিমেষে কেমন করে তারা এক-একটি পাত্র তৈরি করতে পারে। তাই বলে কি মাটির শিল্পকর্ম তৈরিতে কয়েল পদ্ধতি অপ্রয়োজনীয় ও অকেজো হয়ে পড়েছে? মোটেই না। ছোটো-বড়ো অনেক জিনিসই আছে যা কয়েল পদ্ধতিতেই তৈরি করতে হয়, চাকা দিয়ে করা যায় না। তাই এই পদ্ধতির গুরুত্বও কম নয়। কাজের মধ্য দিয়ে এই পদ্ধতি ভালোভাবে আয়ত্ত করতে পারলে আমরা মাটির পাত্র ছাড়াও অনেক সুন্দর সুন্দর জিনিস তৈরি করতে পারব। ইতোমধ্যে মাটির কয়েল দিয়ে আমরা যেসব পাত্র তৈরি করেছি সেগুলোর ভেতরদিকই শুধু মসৃণ করেছি, বাইরের দিক রয়েছে খাঁজকাটা। আমরা হয়তো মনে করতে পারি মাটির কয়েল দিয়ে কোনোকিছু তৈরি করলে বাইরের দিকটায় কয়েলের খাঁজ রাখতেই হয়। না, এরকম কোনো নিয়ম নেই। ইচ্ছা করলেই ভেতরে বাইরে দুদিকেই মসৃণ করতে পারি। তবে এক্ষেত্রে কয়েল তৈরির জন্য মাটির লতাটি পেনসিলের চেয়ে সামান্য একটু মোটা রাখতে হবে। মাটি থাকবে যথাসম্ভব নরম। এবার মাটির কয়েল দিয়ে ভেতর-বাহির মসৃণ একটি পাত্র তৈরির চেষ্টা করি।

উপকরণ ও হাতিয়ার

যেহেতু মাটির পাত্র তাই মাটিই তার মূল উপকরণ। পাত্র তৈরির জন্য অতি সামান্য কিছু হাতিয়ারের প্রয়োজন, যা এর আগেও আমরা ব্যবহার করেছি। এবার অতি সাধারণ দু-একটা জিনিসের নাম যোগ হচ্ছে। প্রয়োজনীয় হাতিয়ারের তালিকা জেনে নিই।

১) কাঠের মসৃণ বেলোন অথবা বাঁশের একটা চোঙা।

২) বাঁশের চটা দিয়ে তৈরি ছুরি।

৩) কাঠের পাতলা চটা দিয়ে তৈরি 'মডেলিং টুল'।

৪) কাঠ বা বাঁশের কাঠির মাথায় তার লাগিয়ে তৈরি 'মডেলিং টুল'।

৫) চোখা মাথার একটি ছোটো ছুরি বা চাকু। ছুরিটি লোহা কাটার করাতের ভাঙা টুকরো দিয়ে তৈরি করা যেতে পারে।

৬) একটি স্কেল।

৭) লোহা কাটার করাতের ছোটো-বড়ো টুকরো।

৮) এক টুকরো স্পঞ্জ বা ফোম।

৯) এক টুকরো মোটা পুরনো কাপড়।

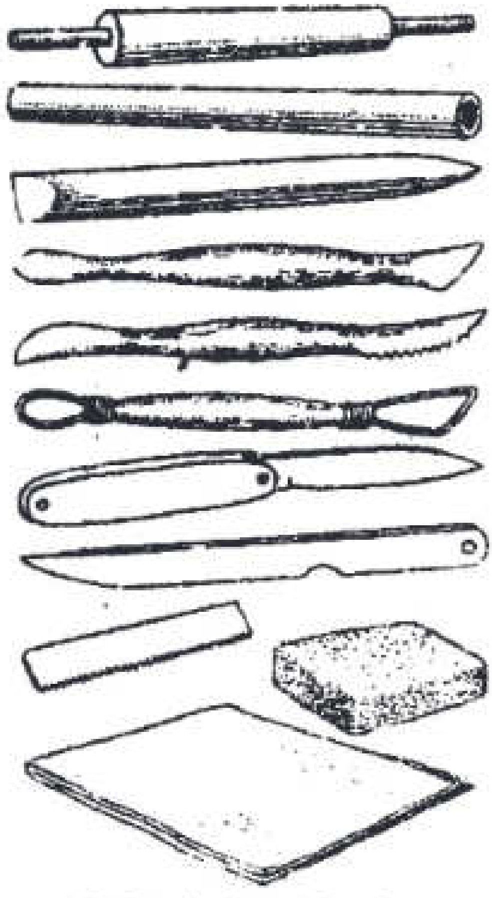

মাটির শিল্পকর্ম তৈরির জন্য কিছু হাতিয়ার

এই হাতিয়ারগুলো জোগাড় করা আমাদের জন্য মোটেই কঠিন হবে না। এর মধ্যে কয়েকটি তৈরি করে নিতে হবে।

পাঠ : ১১

মাটির কয়েল দিয়ে মসৃণ পাত্র তৈরি

মাটি দিয়ে কয়েল কীভাবে তৈরি করতে হয় তা তো আমরা জানি। পাত্র তৈরির কাজ আরম্ভ করার আগে কাগজে পাত্রটির ছবি ও নকশা এঁকে নিই। পাত্রটি যত বড়ো হবে ছবি ও নকশা ঠিক তত বড়ো করে আঁকব। তাতে কাজের সময় কিছুক্ষণ পরপর মাপ ও গড়ন নকশার সাথে মিলিয়ে দেখতে সুবিধা হবে। এবার কী ধরনের পাত্র তৈরি করব তা ঠিক করে নিই। একটা ফুলদানি করি, তবে সাদামাটা চোঙার আকৃতি নয়।

মাটির কয়েল তৈরি

ছুরি দিয়ে ফুলদানির তলা কেটে নিতে হয়

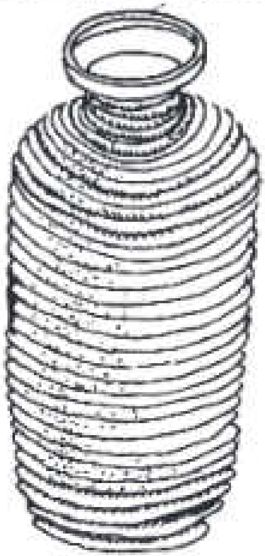

কয়েল দিয়ে অনেক বড়ো বড়ো পাত্র তৈরি করা সম্ভব

কয়েল লাগানোর পর পাত্রের ভেতর দিকের দাগ মিলিয়ে সমান করে দিতে হয়

ফুলদানির গড়ন নিচের দিক থেকে আস্তে আস্তে মোটা হয়ে ওপরের দিকে উঠবে। বেশ উঁচু হওয়ার পর আবার ছোটো হয়ে একটা গলার মতো হবে। মুখের ব্যাস হবে গলার থেকে সামান্য বেশি। সব মিলিয়ে ফুলদানিটির গড়ন হবে লম্বাটে। গলায় একটা মালা এঁকে দিলে বেশ লাগবে। ফুলদানির ছবি ও নকশা এঁকে নিই, তারপর তৈরির কাজ আরম্ভ করি। প্রথমে পরিমাপমতো মাটি বেলোন অথবা বাঁশের চোঙায় বেলে এক সেন্টিমিটার রুটির মতো তৈরি করে নকশার মাপ অনুযায়ী ফুলদানির তলার জন্য কাটি। এবার মাপমতো একটি মাটির কয়েল তৈরি করে তলার কিনারা বরাবর বসাই। বসাবার আগে কয়েলের নিচ ও তলার কিনারা পানি দিয়ে স্যাঁতসেঁতে করে নিতে ভুলব না। প্রথমে কয়েলের বাইরের দিকে বাম হাতের মাঝের আঙুল দিয়ে হালকা চাপ রেখে ডান হাতের তর্জনীর মাথা দিয়ে একটু একটু করে ভেতরের দিকের মাটি নিচের দিকে টেনে নামিয়ে তলার সাথে কয়েলটি জোড়া দিই। কয়েল যেন সম্পূর্ণ গোল থাকে। এবার বাম হাতের মাঝের আঙুলটি কয়েলের ভেতরের দিকে বসিয়ে ডান হাতের তর্জনীর মাথা দিয়ে কয়েলের বাইরের দিকের মাটি টেনে নামিয়ে তলার সাথে জোড়া দিই। কয়েলটি ভেতর-বাহির দুদিকেই তলার সাথে যুক্ত হয়ে গেল। নকশা দেখে মাপ অনুযায়ী দ্বিতীয় কয়েল তৈরি করে প্রথম কয়েলের ওপর বসাই এবং একই নিয়মে ভেতর ও বাইরের

মাটি টেনে নামিয়ে তলার সাথে জোড়া দিই। কয়েলটি ভেতর-বাহির দুদিকেই তলার সাথে যুক্ত হয়ে গেল। নকশা দেখে মাপ অনুযায়ী দ্বিতীয় কয়েল তৈরি করে প্রথম কয়েলের ওপর বসাই এবং একই নিয়মে ভেতর ও বাইরের মাটি টেনে নামিয়ে জোড়া দিই। এভাবে একটির ওপর আরেকটি কয়েল বসিয়ে নকশা অনুযায়ী ফুলদানিটি তৈরি করি। কয়েকটি কয়েল বসানোর পর এক এক বার কাঠের মডেলিং টুল দিয়ে টেনে ও ঘষে ফুলদানির ভেতরের ও বাইরের অসমান মাটি সমান করে নেব। একটি বিষয়ে অবশ্যই খুব সজাগ থাকতে হবে, তা হলো প্রত্যেকটি কয়েল তৈরির সময় নকশা অনুযায়ী মাপ দেখে নিতে হবে। নিচ থেকে প্রত্যেকটি কয়েলে ব্যাস একটু একটু করে বেড়ে বেড়ে ওপরের দিকে উঠবে, আবার একটু একটু করে কমে কমে গলার

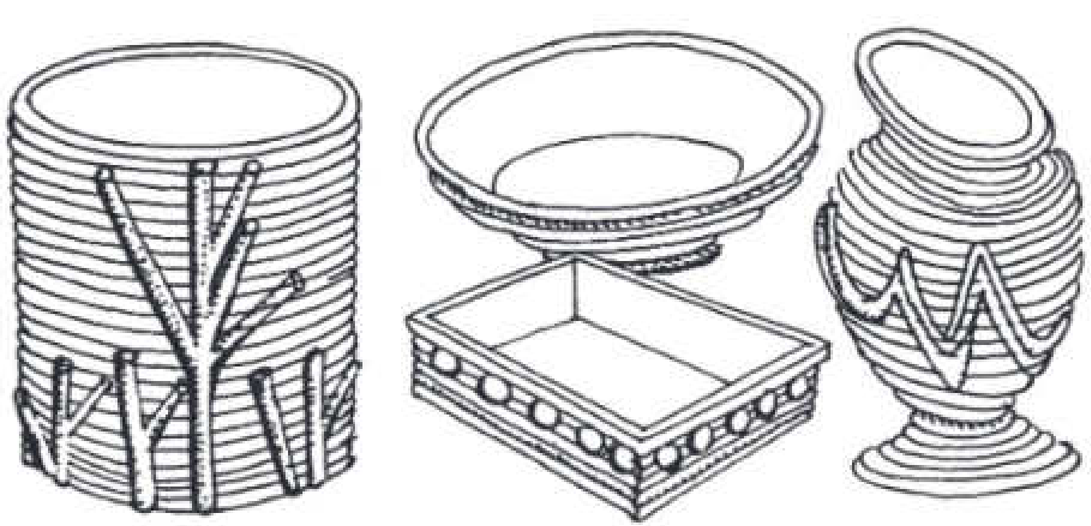

মাটির কয়েল দিয়ে তৈরি বিভিন্ন শিল্পকর্ম

মাঝামাঝি গিয়ে বাড়বে। প্রত্যেকটি কয়েল বসানোর সময় জোড়ার জায়গাটা পানি দিয়ে অবশ্যই স্যাঁতসেঁতে করে নেব। গড়ন শেষ করার পর এবার ফুলদানিটি মসৃণ করার পালা। লোহা কাটার করাতের ভাঙা টুকরো দিয়ে খুব সহজেই ফুলদানির বাইরের দিকটা মসৃণ করে নিতে পারি। করাতের কাঁটা-কাঁটা দিক দিয়ে চারদিক থেকে টেনে টেনে চেঁছে ফুলদানির গায়ের উঁচু-নিচু মাটি প্রথমে সমান করে নিই। এবার করাতের টুকরোর সোজা দিকটা একটু কাত করে ধরে টেনে পাত্রের ওপরটা হালকাভাবে চেঁছে মসৃণ করি। ভেজা স্পঞ্জ বা ফোম চিপড়ে নিয়ে তা দিয়ে স্যাঁতসেঁতে অবস্থায় পাত্রটির গা ঘষে দিই। পাত্রটি আরও মসৃণ হয়ে গেছে। সবশেষে ছুরির চোখা মাথা দিয়ে খোদাই করে ফুলদানিটির গলার নিচে মালার মতো একটি অলঙ্কার এঁকে নিই। একটি কথা বলে রাখা প্রয়োজন– ফুলদানি তৈরির কাজ এক দিনে শেষ করতে না পারলে পলিথিন দিয়ে জড়িয়ে রাখব।

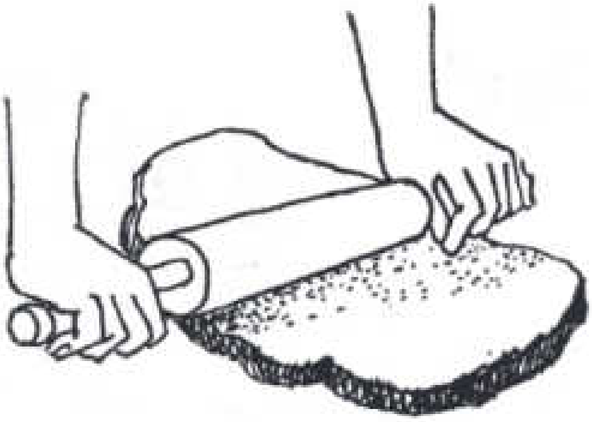

মাটির ফলকে চিত্র ও নকশা তৈরির কিছু নমুনা

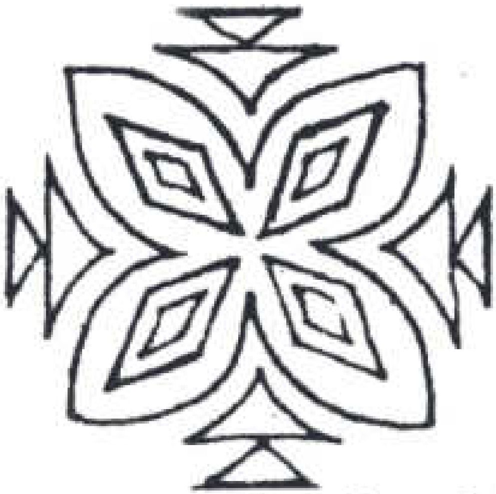

মাটির ফলকে চিত্র ও নকশা তৈরির কিছু নমুনা

ফুলদানিটি এখন ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ভালো করে লক্ষ করি। দেখব তৈরি ফুলদানি হয়তো আমার আঁকা ছবি ও নকশার সাথে হুবহু মিলছে না। হয়তো গড়নে পার্থক্য হয়ে গেছে, কোথাও কোথাও বাঁকা হয়ে গেছে। হোক না এরকম, তাতে কী আসে যায়? একটা ফুলদানি যে তৈরি করতে পারলে সেটা কি কম কথা, কম আনন্দের? প্রথম প্রথম এরকম হবেই, ঘাবড়াবার কিছুই নেই। অনেকদিন চর্চার পর সবই ঠিক হয়ে যাবে। তবে ধৈর্য ধরে কাজ করতে হবে। কয়েল পদ্ধতিতে যে কোনো আকৃতির যত খুশি বড় জিনিস তৈরি করতে পারব। সবার আগে প্রয়োজন পদ্ধতিটিকে ভালোভাবে আয়ত্ত করে নেওয়া। ছবির নকশা ও নমুনা দেখে পাত্রগুলো তৈরি করতে চেষ্টা করি।

শহিদমিনার

পাঠ : ১২ ও ১৩

মাটির ফলকের নকশা

পোড়ামাটির ফলকে শিল্পকর্মের জন্য আমাদের দেশ এক সময় খুবই বিখ্যাত ছিল। দেশের প্রাচীন শিল্পকর্মের যেসব নিদর্শন আমরা এখনও দেখতে পাই, বলতে গেলে তার প্রায় সবকিছুই পোড়ামাটির ফলকচিত্রের মধ্যে পড়ে। পাহাড়পুর ও ময়নামতির বৌদ্ধবিহারে প্রাপ্ত ফলকচিত্রে যেসব হাজার বছরের পুরনো শিল্পকর্মের নিদর্শন দেখতে পাওয়া যায়, তেমনি বগুড়ার মহাস্থানগড়, বাগেরহাটের ষাটগম্বুজ মসজিদ, নওগাঁর কুসুম্বা মসজিদ ও দিনাজপুরের কান্তজীর মন্দিরে প্রায় তিনশো বছর আগে পর্যন্ত, ক্রমানুসারে পরবর্তী বিভিন্ন সময়ের শিল্পকর্মের নিদর্শন দেখতে পাওয়া যায় পোড়ামাটির এই ফলকচিত্রের মধ্যেই। ছবি বা অন্য কোনো মাধ্যমে শিল্পকলা বিষয়ে প্রাচীন ঐতিহ্যের তেমন কোনো নিদর্শন আমরা দেখতে পাই না। এবার নিশ্চয়ই বুঝতে পারছি আমাদের কাছে ঐতিহ্যগতভাবে পোড়ামাটির চিত্রের গুরুত্ব কত বেশি। তাহলে মাটির ফলকে একটি ছবি তৈরি করি।

উপকরণ ও হাতিয়ার লাগবে ফুলদানি তৈরি করার সময় যা ব্যবহার করেছি তাই। নতুনের মধ্যে এক সেন্টিমিটার পুরু স্কেলের মতো লম্বা দুটি কাঠের রুল হলে কাজের সুবিধা হবে। মাটির ফলকে ছবি তৈরি করার আগে ছবিটি কাগজে এঁকে নিতে হবে। মানুষ, পশু, পাখি যা খুশি তা আঁকতে পারি। মাটির ফলকে যত বড়ো ছবি করব ঠিক তত বড়ো ছবি আঁকি। তরকারির ঝুড়ি মাথায় লুঙ্গি পরা একটি গাঁয়ের লোক আঁকি। খুব ভালো হবে। লোকটির চারপাশে কিছু জায়গা রেখে ছবির ফ্রেমের মতো বর্ডার দিই। একটু পাতলা কাগজের ওপর কার্বন কাগজের সাহায্যে বর্ডারসহ ছবির একটি অনুলিপি বা কপি করে বর্ডার বরাবর মাটির ফলকে চিত্র ও নকশা তৈরির কিছু নমুনা চারদিকে কেটে রাখি। এবার পাঁচ ছয় সেন্টিমিটার ব্যাসের এক দলা নরম মাটি নিই। সিমেন্টের মেঝের ওপর কিংবা পিঁড়ির ওপর রেখে প্রথমে হাত দিয়ে চেপে একটু চ্যাপ্টা করে নিই। বেলোন অথবা বাঁশের চোঙা দিয়ে এই চ্যাপ্টা করা মাটি বেলে, এক সেন্টিমিটার পুরু রুটির মতো মাটির

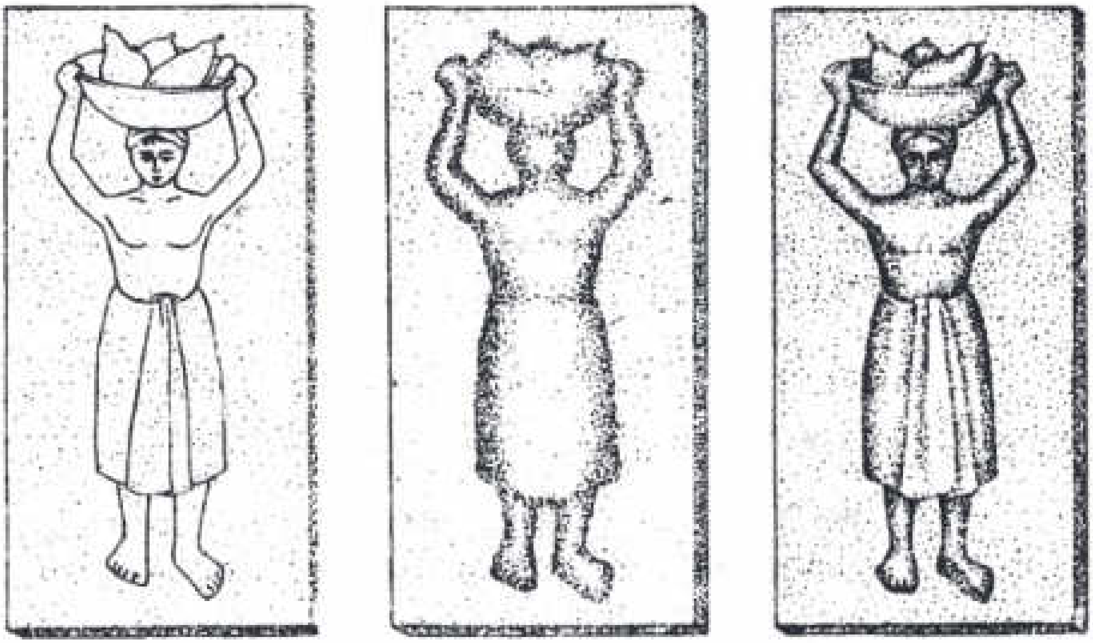

মাটির ফলকে চিত্র তৈরির কিছু নমুনা

স্ল্যাব বা ফলক তৈরি করি। মাটি বেলার সময় এক সেন্টিমিটার পুরু কাঠের রুল দুটি মাটির দুপাশে বসিয়ে, তার ওপর ছবির কার্বন কপি বসাই। স্কেল ধরে কাগজের বর্ডার বরাবর ছুরির মাথা দিয়ে চারদিকের বাড়তি মাটি কেটে দিই। এবার চোখা করে কাটা পেনসিলের মাথা হালকাভাবে ছবির ওপর দিয়ে চালিয়ে যাই, যাতে নিচের মাটিতে হালকা দাগ পড়ে। সম্পূর্ণ ছবির ওপর দিয়ে পেনসিল চালানো শেষ হয়ে গেলে কাগজটি মাটির ওপর থেকে তুলে নিই। মাটির ফলকের ওপর ছবির সুন্দর ছাপ পড়ে গেছে। প্রথম যখন মাটির কাজ শিখতে আরম্ভ করেছিলাম, তখন নরম মাটির ঢেলা খালিহাতে চেপে, টেনে ও টিপে টিপে কীভাবে বিভিন্ন আকৃতির পুতুল, হাতি, ঘোড়া তৈরি করেছি তা আমাদের মনে আছে। এখন মাটির ফলকে ছবি তৈরির সময় সেই অভিজ্ঞতা কাজে লাগাতে হবে।

কাগজে প্রথম যে ছবিটি এঁকেছি তা সামনে রাখি। এবার নরম মাটি নিই এবং ছবি দেখে টিপে টিপে পর্যায়ক্রমে মানুষটির মাথা, শরীর, হাত, পা, লুঙ্গি ইত্যাদির আদলে এক-একটি অংশ তৈরি করে মাটির ফলকে বসাবার পর আরেকটি অংশ তৈরি করে বসাব। এগুলো যাতে ফলকের ওপর ভালোভাবে মিলেমিশে বসতে পারে তার জন্য নিচের দিকটা চ্যাপ্টা বা সমান করে নিই। ওপরের দিকটা শরীরের গড়ন অনুযায়ী হবে। ফলকের যেখানে যখন এক-একটি অংশ বসাব, ছবির ছাপ অনুযায়ী ফলকের ঐ জায়গাটায় একটুখানি পানি লাগিয়ে বাঁশের চোখা ছুরি দিয়ে আঁচড়ে আঁচড়ে কিছুটা কাদা কাদা করে নিয়ে তবে বসাব। এভাবে বসিয়ে একটু চাপ দিই যাতে অংশটি ভালোভাবে বসে এবং নিচে বাতাস থাকতে না পারে। লক্ষ করি চাপ দেওয়ার সময় নিচ থেকে কিছু-কিছু কাদা বেরিয়ে আসছে। বাঁশের ছুরির চোখা মাথা দিয়ে টেনে কাদাটুকু সমান করে নিই। এভাবে ফলকের ওপর মাটি বসিয়ে ছবি তৈরির কাজ সম্পন্ন করে নিই। এবার দেখি,

মাটির ফলকের ওপর তরকারির ঝুড়ি মাথায় লুঙ্গি পরা গাঁয়ের লোকটির ছবি কেমন সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। ছবি তৈরির কাজ কিন্তু এখনও পুরোপুরি শেষ হয়নি। ছবিটি ছুরিতে ফিরিয়ে খুব ভালো করে দেখি। কোথাও একটু মাটি লাগাতে হলে জায়গাটা পানি দিয়ে একটু স্যাঁতসেঁতে করে মাটি লাগাই। গড়ন ঠিক করার পর ছবির চারদিকে ফলকের কিনারা বরাবর দুই সেন্টিমিটার চওড়া ও প্রায় এক সেন্টিমিটার উঁচু করে মাটি বসিয়ে ফ্রেমের মতো করি। এবার বাঁশের ছুরি দিয়ে খুব সাবধানে একটু একটু করে চেঁছে ফ্রেমসহ ছবিটিকে মসৃণ করে নিই। মসৃণ করার পর ছুরির চোখা মাথা দিয়ে খোদাই করে লোকটির চোখ, মুখ ও লুঙ্গির চেক এঁকে দিই। মাথার ঝুড়িতেও কয়েকটি আঁচড় দিয়ে বুনন দেখাতে পারি।

মাটির ফলকে ছবি তো তৈরি করলাম। এবার ছবিটাকে ঝুলানোর একটা ব্যবস্থা করা দরকার। মাটি দিয়ে হাতের আঙুলের মাথার সমান দুটি মালা তৈরি করি। ঝাড়ুর শলা বা এরকম সরু কিছু দিয়ে মালার ভেতরে মোটা সুতা ঢোকাবার মতো ছিদ্র করি। মালা দুটির এক পাশ সামান্য কেটে একটু সমান করে নিই। এবার ছবির পেছন দিকে ওপরে দুই কোনায় মালা দুটি বসিয়ে ভালো করে জোড়া দিই। মালা দুটির ছিদ্র যেন বন্ধ না হয় এবং লম্বালম্বিভাবে বসে। মালা দুটির ভেতর দিয়ে শক্ত সুতা পরিয়ে এ- ছবি দেয়ালে ঝুলিয়ে রাখতে পারি, আবার কোনোকিছুর সাথে ঠেস দিয়ে কোনো মানানসই জায়গায় দাঁড় করিয়ে রাখতে পারি। যেভাবেই রাখি খুব সুন্দর দেখাবে।

মাটি দিয়ে কিছু পাত্র ও ফলকচিত্র তৈরি করা তো শেখা হলো। মাটির তৈরি এসব জিনিস ভালো করে শুকিয়ে পোড়ানোর ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। ছায়ায় রেখে ধীরে ধীরে শুকোতে হবে তা তো জানা আছে। এতে সময় লাগবে সত্যি, কিন্তু বাঁকা হওয়ার বা ফেটে যাওয়ার ভয় থাকে না। ভালো করে শুকাল কি না, তা বুঝব কী করে? একটা শুকনো জিনিস হাতে নিয়ে তার তলায় বা পেছনের দিকে নখ দিয়ে একটু আঁচড় দিলে যদি দেখি আঁচড়ের জায়গাটা সাদাটে হয়ে গেছে, তাহলে বুঝবো জিনিসটি ভালোভাবেই শুকিয়ে গেছে। তা না হলে আরও শুকাতে হবে। শুকনো জিনিস ভেজা হাতে ধরলে বা পানি লাগলে ফেটে যাবে, তাই খুব সাবধান থাকব। আশেপাশে কোথাও কুমারবাড়ি থাকলে কুমারদের কাছ থেকে আমাদের তৈরি জিনিসগুলো পুড়িয়ে নেওয়ার ব্যবস্থা করতে পারি। তা না হলে কাঠের গুঁড়ি অথবা ধানের তুষ দিয়ে নিজেই পোড়াতে পারি।

পাঠ : ১৪

ফেলনা জিনিস দিয়ে শিল্পকর্ম

কাজে লাগবে না বলে অনেক জিনিস আমরা ফেলে দিই। মনে করি আবর্জনা তাই ফেলে দিই, এ ছাড়া আর কী করার আছে? আমরা কদবেল খেয়ে খোলস ফেলে দিই। হাঁস-মুরগির পালকগুলোকে আমরা আবর্জনা মনে করি। আমাদের কল্পনাশক্তি, চিন্তা-ভাবনা এবং সুন্দর জিনিস তৈরির আগ্রহটাকে কাজে লাগিয়ে দেখি না এই ফেলে দেওয়া কদবেলের খোলস, পালক ইত্যাদি দিয়ে সুন্দর কোনো কিছু তৈরি করতে পারি কি না।

কদবেলের খোলস দিয়ে খেলনা বা পুতুল

কদবেলের খেলনা

আমাদের দেশে কদবেল পাওয়া যায়। পাকা কদবেল খেয়ে খোলা আমরা ফেলে দিই। পাকা কদবেলের মুখে ছোট একটি ফুটো করে কাঠি ঢুকিয়ে সাবধানে ভেতরের নির্যাসটুকু বের করে নিয়ে, কদবেলের খোসা আস্ত রাখলে এটা দিয়ে সুন্দর পুতুল তৈরি করতে পারব। আস্ত খালি খোসা কয়েকদিন রেখে দিলে শুকিয়ে যাবে। এবার একটি ছুরি দিয়ে আস্তে আস্তে চেঁছে এটিকে মসৃণ করে নিই। এভাবে দুইটি কদবেলের খোসা ঠিক করে নিই। এরপর একটিতে হলুদ রং (ভার্নিশ কালার) করি। অন্যটি পছন্দমতো যে-কোনো রং করি। দ্বিতীয় বলটিতে কিছু বালি অথবা ছোটো ছোটো কাঁকর দিয়ে ভরে ভারী করি। দ্বিতীয় বলটির উপর প্রথম বলটি আইকা গাম দিয়ে আটকিয়ে দিই। এবার হলুদ বলটিতে চুল, চোখ, মুখ ও ঠোঁট আঁকি এবং অন্য বলটিতে নকশা এঁকে নিই। দেখি কেমন চমৎকার একটি পুতুল তৈরি হয়ে গেল। এটি পড়ার টেবিলে পেপার ওয়েট হিসেবে ব্যবহার করতে পারব অথবা বন্ধুদেরও উপহার দিতে পারব।

পাঠ : ১৫

পালক দিয়ে ফুল

হাঁস-মুরগির ছোটো সাদা পালকগুলো আলাদা করে পানিতে গোলানো লাল, হলুদ, বেগুনি ইত্যাদি রঙে চুবিয়ে শুকিয়ে নিই। মুরগির লম্বা সাদা পালকও সবুজ রং করে শুকিয়ে নিতে হবে। কিছু হলুদ রং করে শুকিয়ে রাখি। মুরগির সবুজ, নীল, কালচে সবুজ পালকগুলোও বেছে পরিষ্কার করে রাখি। সামান্য শক্ত এক টুকরো সবুজ রঙের কাগজ নিয়ে এক টাকার কয়েনের সমান গোল একটি চাকতি তৈরি করি। সবুজ রঙের উপযুক্ত কাগজ না পেলে সাদা কাগজই রং করে শুকিয়ে নিতে পারি। কাগজের চাকতিটির পরিধি থেকে কেন্দ্র পর্যন্ত এক জায়গায় কেটে নিই। এবার কাটা এক পাশেরও অপর পাশ তুলে শক্ত আঠা দিয়ে জোড়া দিই। দেখি, চাকতির মাঝখানটায় কোণের মতো গর্ত হয়ে গেল। এবার গর্তের দিকে চাকতির ভেতরে আইকা আঠা লাগিয়ে যে-কোনো এক রঙের ছোটো ছোটো পালক ফুলের পাপড়ির মতো এক এক করে বসিয়ে দিই। চারদিক ঘুরিয়ে পালক বসানোর পর দেখি জিনিসটি কেমন সুন্দর ফুলের মতো দেখাচ্ছে। এবার ঝাড়ুর শলা (নারকেলপাতার শলা) বিশ-একুশ সেন্টিমিটার লম্বা করে কাটি। শলার মাথায় আঠা লাগিয়ে হলুদ রঙের তুলা জড়িয়ে এক সেন্টিমিটার ব্যাসের আমলকীর মতো একটি গুটি তৈরি করি। শলার মাথাটি যেন গুটির ভেতরে ঢোকানো থাকে এবং গুটি যেন শলার সাথে শক্ত হয়ে লেগে থাকে। শলার অপর মাথাটা পালকের ফুলের

মাঝখান দিয়ে ঢুকিয়ে টেনে নিচে নামিয়ে দিই, যাতে তুলার গুটিটি ফুলের পাপড়ির ঠিক মাঝখানে চেপে বসে যায়। বসানোর আগে গুটির নিচের দিকে ভালো করে আইকা আঠা লাগিয়ে পালক দিয়ে ফুল তৈরি করি। এভাবে ফেলনা জিনিস দিয়ে কেটে-ছেঁটে আঠা লাগিয়ে অনেক কিছু করা যায়। এবার শলাটির সারা গায়ে আঠা লাগিয়ে পাতলা সবুজ কাগজ দিয়ে সুন্দর করে মুড়ে নিই। কাগজে মোড়া হয়ে গেলে সবুজ রঙের কয়েকটি লম্বা পালকের গোড়ার দিকে পেলিগাম বা আইকা আঠা লাগিয়ে শলার সাথে জুড়ে দিই, যাতে পালকগুলো পাতার মতো দেখায়। সবুজ রং করা পালকের সাথে দুই-তিনটা সবুজ-নীল, কালচে-সবুজ রঙের পালক বসালে খুবই সুন্দর দেখাবে। এভাবে পালক বসানোর পর পালকের গোড়া ময়দার আঠা লাগানো পাতলা সবুজ কাগজ পেঁচিয়ে ঢেকে দিই। এবার দেখি পালকের তৈরি ফুল, পাতা ও ডাঁটাসহ কেমন সুন্দর দেখাচ্ছে। এভাবে নানান রঙের ফুল তৈরি করে ফুলদানিতে সাজিয়ে রাখলে খুব সুন্দর দেখাবে। পালক দিয়ে ফুল তৈরি করার একটি পদ্ধতি জানা হলো। এবার নিজেদের বুদ্ধিতে, নিজেদের পছন্দমতো অন্য কোনোরকমের ফুল বা অন্য কোনো জিনিস তৈরি করার চেষ্টা করব।

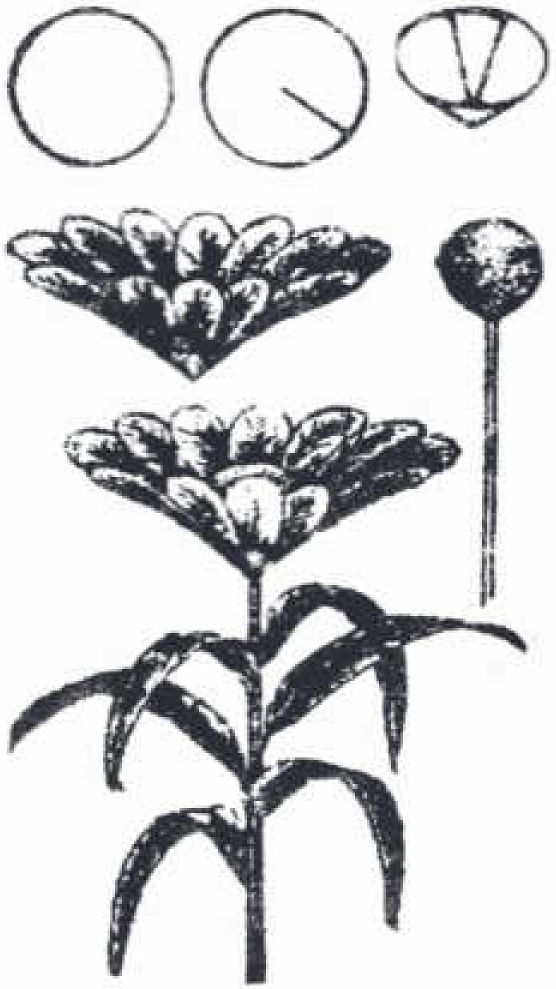

পাখির পালক দিয়ে ফুল

পাঠ : ১৬ ও ১৭

পাটের আঁশ বা উল দিয়ে সুন্দর একটি হাঁসের ছানা তৈরি

আমরা উল দিয়ে পমপম তৈরি করেছি। ঠিক একই নিয়মে পাটের আঁশ দিয়ে একটি হাঁসের ছানা তৈরি করতে পারি। নিচের ছবি দেখে অনায়াসে হাঁসের ছানাটি তৈরি করতে পারব। মোটা কাগজ যারা না পাবে তারা পুরনো চিঠির পোস্টকার্ড নিয়ে তিন ইঞ্চি ব্যাসের দুইটি গোলাকৃতি এঁকে কেটে নেবে। বড়ো গোলাকৃতি দুটির ঠিক মাঝে ছোট করে গোল এঁকে কেটে বের করি। এর পর সুই-এর সাহায্যে উল অথবা পাটের আঁশ পরিয়ে গোল চাকতি দুটো একসাথে নিয়ে এমনভাবে বার বার ঘুরিয়ে সম্পূর্ণ ভরব, যেন একটুও ফাঁক না থাকে। এবার কাঁচি দিয়ে চারধার একটু কেটে কাগজের চাকতি দুটোর ফাঁকে একটু শক্ত করে সুতো বা উল দিয়ে বেঁধে নেব। এবার কাগজ ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে একটা অংশ কাঁচি দিয়ে ছেঁটে মাথার আকৃতি করি। এবং

নিচের অংশ শরীরের কাজ করবে। (যারা পাটের আঁশ দিয়ে করবে তারা সরু তার ভাঁজ করে একটি সুইয়ের মতো করে নেবে)। এবার কাগজ কেটে চোখ ও ঠোঁট বানিয়ে আঠা দিয়ে লাগিয়ে দেব। চোখের রং কালো ও ঠোঁট হলুদ বা লাল করে দিলে সুন্দর দেখাবে। এবার হাঁসটি তৈরি হয়ে গেলে হাঁসের গলায় সুন্দর সরু ফিতা বেঁধে দিলে আরও সুন্দর দেখাবে।

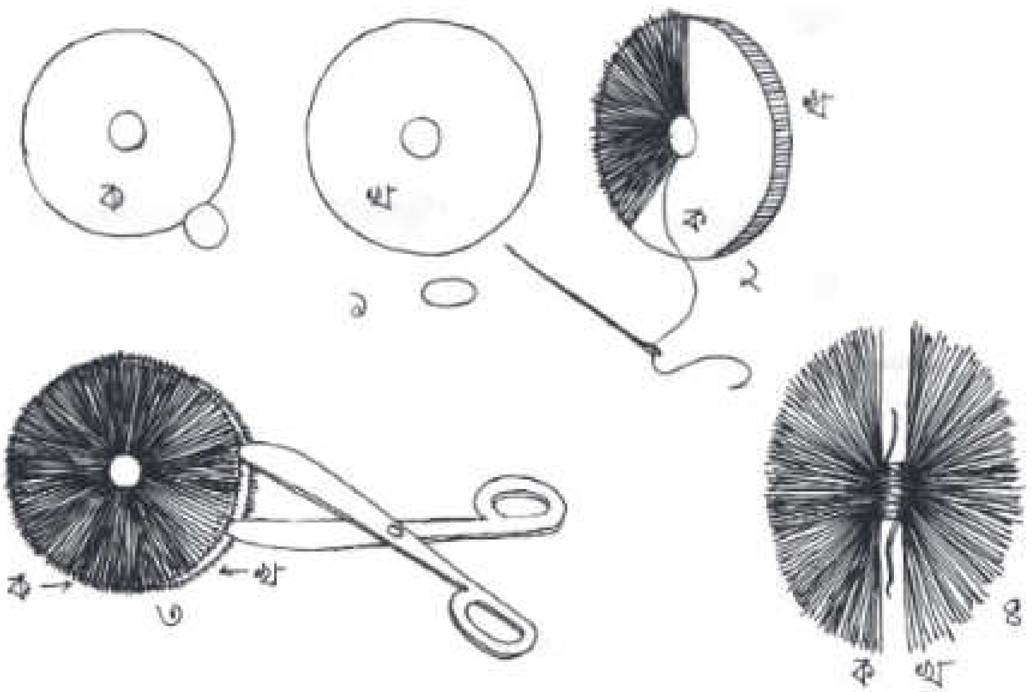

এভাবে তিনটি হাঁসের ছানা তৈরি করে একটি সেট বানাতে পারি। এটি আমরা বন্ধুদের জন্মদিনে উপহার দিতে পারি বা নিজের ঘরে রেখে সাজাতে পারি। বন্ধুদের উপহার দেবার জন্য আমরা তিনটি পুতুলের সেট তৈরি করে নিতে পারি। এজন্য একটি বড়ো ও দুটো ছোটো হাঁসের ছানা তৈরি করে একটি হার্ডবোর্ড বা মোটা বোর্ড কাগজ লম্বা করে কেটে, হাঁসের ছানাগুলোর নিচের অংশে আঠা লাগিয়ে পর পর তিনটি ঐ হার্ডবোর্ডে সাজিয়ে নিই।

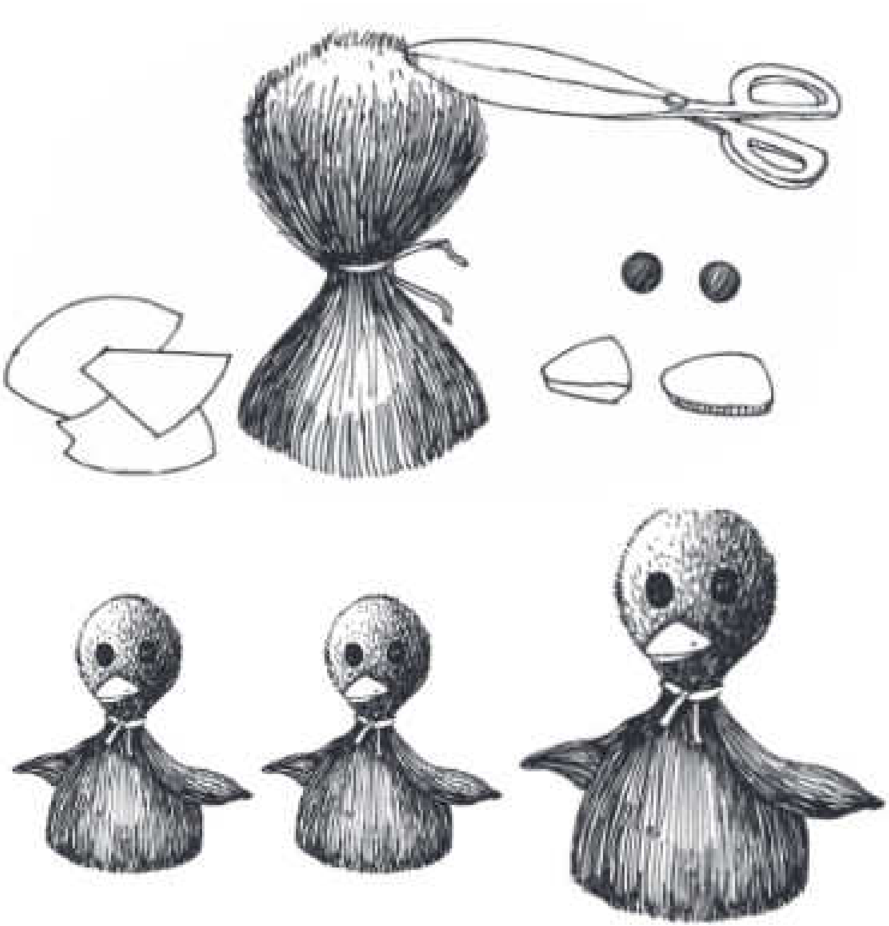

উল বা পাটের আঁশ দিয়ে তুলতুলে হাঁসের ছানা তৈরি।
ছবিগুলো দেখে আমরা অতি সহজেই এ পুতুলগুলো তৈরি করতে পারি।

পাঠ : ১৮ ও ১৯

ফেলনা উল বা পাটের আঁশ দিয়ে ফুল তৈরি

ফুল সবারই প্রিয়। ফুলের গন্ধ ও সৌন্দর্যে আমাদের সবার মন ভরে যায়। এখন একটি ফুল তৈরি করা শিখব তার, উল অথবা পাটের আঁশ দিয়ে।

প্রস্তুতপ্রণালি

প্রথমে ২৪ নং তার কেটে উলের কাঁটা বা যে-কোনো সরু কাঠির গোড়ায় তার আটকিয়ে বার বার ঘুরিয়ে স্প্রিং তৈরি করি। স্প্রিং তৈরি শেষ হলে কাঠি থেকে স্প্রিং খুলে নিই।

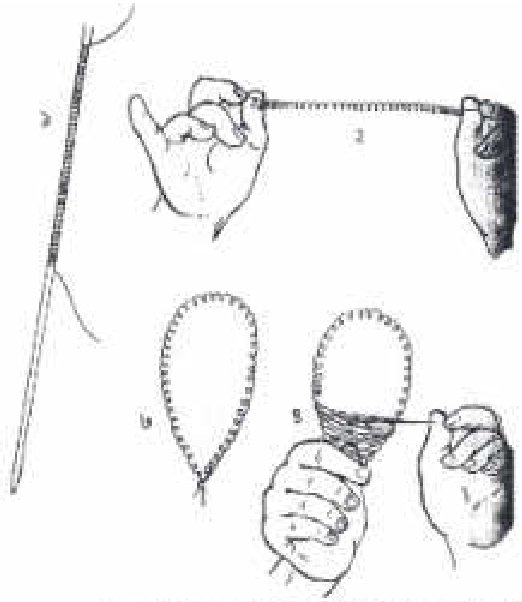

ফেলনা উল বা পাটের আঁশ দিয়ে ফুল তৈরি

এবার স্প্রিংয়ের দুই মাথা দুহাতে ধরে টান দিয়ে আন্দাজমতো লম্বা করে নিই, স্প্রিং খুব বেশি ফাঁক না হয়ে যায়, সেদিকে খেয়াল রাখব। এবার ফুলের পাপড়ি যত বড় করতে চাই, তার দুইগুণ সমান স্প্রিং কেটে নেব। স্প্রিংয়ের দুমাথা আটকিয়ে পাপড়ির আকার করে নেব। এবার উল বা সুতা অথবা পাটের আঁশ স্প্রিংয়ের পাপড়ির গোড়ায় একমাথা বেঁধে অন্য মাথা ধরে একপাশ হতে অন্যপাশে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সম্পূর্ণ পাপড়ি করব। উল বা সুতোর শেষ মাথা পাপড়ির গোড়ায় সোজা এনে বেঁধে নেব। এভাবে পাঁচটি পাপড়ি তৈরি করে নেব। ২০ নং তার ডাঁটা তৈরির জন্য আন্দাজমতো কেটে নেব। এবারে ডাঁটার মাথা সামান্য বাঁকিয়ে হলুদ বা পছন্দমতো উল বা কাগজ দিয়ে মুড়িয়ে ফুলের রেণু বানিয়ে নিই। ঐ পাঁচটি পাপড়ি একের পর এক রেণুর নিচে বেঁধে ফুলটি তৈরি করি। বোঁটার সাথে সবুজ বা ব্রাউন সুতা বা কাগজ দিয়ে মুড়িয়ে দিই। ফুলের পাপড়ির মতো করে একটি পাতা তৈরি করি। পাতাটি ডাঁটার সাথে আটকিয়ে দিই। ডাঁটাসহ একটি সুন্দর ফুল তৈরি হলো। এভাবে অনেকগুলো ফুল তৈরি করতে পারি। এরপর নিজের ঘরে ফুলদানিতে সুন্দর করে সাজিয়ে রাখতে পারি অথবা বন্ধুদের উপহার দিতে পারি।

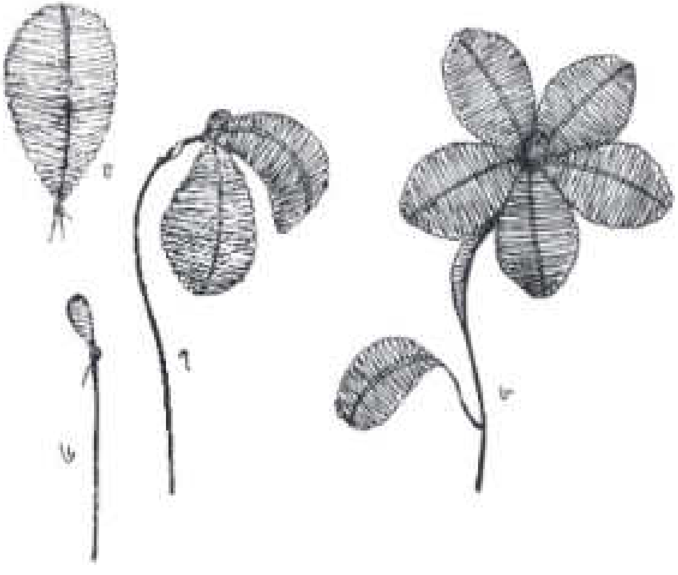

ফেলনা উল বা পাটের আঁশ দিয়ে ফুল তৈরি

নমুনা প্রশ্ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। চীনা মাটির তৈরি সুন্দর সুন্দর জিনিসপত্র ও বাসন কোসন তৈরি হয় কী দিয়ে?

ক. মাটি
খ. বিশুদ্ধ সাদা মাটি
গ. সাদা সিমেন্ট
ঘ. সাদা প্লাস্টার

২। প্রাচীন শিল্পকর্মে আমরা বেশিরভাগ কোন নিদর্শন দেখতে পাই?

ক. পোড়ামাটির ফলকচিত্র
খ. মাটির তৈরি ফুলদানি
গ. পোড়ামাটির পাত্র
ঘ. মোজাইক চিত্র

৩। ফেলনা জিনিস দিয়ে কী তৈরি করা যায়?

ক. মাটির পুতুল
খ. শিল্পকর্ম
গ. পোস্টার
ঘ. সূচিশিল্প

৪। পাতলা কাঠ কেটে নকশা নির্মাণের জন্য অতি সরু যে করাত ব্যবহার করা হয় তার নাম কী?

ক. 'হ্যাক-স্য'
খ. 'হ্যান্ড-স্য'
গ. 'ফ্রেট-স্য'
ঘ. সাধারণ করাত

৫। প্রাথমিক পর্যায়ে পুতুল তৈরির জন্য সবচেয়ে উপযোগী কাঠ কোনটি?

ক. শাল ও গজারি
খ. শিল, কড়ই
গ. গর্জন ও লোহাকাঠ
ঘ. শিমুল ও কদম

৬। তুরপুন সাধারণত কোন কাজে ব্যবহার হয়?

ক. গাছকাটা
খ. কাঠ চেরা
গ. ছিদ্র করা
ঘ. বাঁকা করা

ব্যবহারিক (Activity)

১। কাপড় ও পিচবোর্ড দিয়ে তোমার পছন্দমতো দেয়ালে ঝোলানোর উপযোগী একটি পুতুল তৈরি করো।

২। কাপড় ও পিচবোর্ড দিয়ে একটি হাতি তৈরি করো।

৩। খুব সহজ পদ্ধতিতে তোমার পছন্দমতো একটি কাঠের পুতুল তৈরি করো।

৪। মাটির স্ল্যাব দিয়ে একটি সুন্দর নকশা বা ফলক তৈরি করো।

৫। মাটির একটি ফুলদানি তৈরি করো।

৬। মাটি দিয়ে একটি শহিদমিনার তৈরি করো।

৭। ফেলনা উল বা পাটের আঁশ দিয়ে একটি হাঁসের ছানা তৈরি করো।

৮। কদবেলের খোলস দিয়ে একটি খেলনা তৈরি করো।

রচনামূলক

১। বোর্ড কাগজ ও কাপড় দিয়ে একটি পুতুল তৈরি করার সহজ পদ্ধতি বর্ণনা করো।

২। বোর্ড কাগজ ও কাপড় দিয়ে একটি হাতি তৈরির সহজ পদ্ধতি বর্ণনা করো।

৩। কাঠ দিয়ে একটি পাখি তৈরি করার পদ্ধতি বর্ণনা করো।

৪। মাটি দিয়ে একটি নকশাফলক তৈরির পদ্ধতি বর্ণনা করো।

৫। মাটি দিয়ে একটি ফুলদানি তৈরির পদ্ধতি বর্ণনা করো।

৬। ফেলনা পাট বা উল দিয়ে তারের সাহায্যে একটি ফুল তৈরির পদ্ধতি বর্ণনা করো।

পরিশিষ্ট

রং ও রঙিন ছবি

প্রাথমিক রং

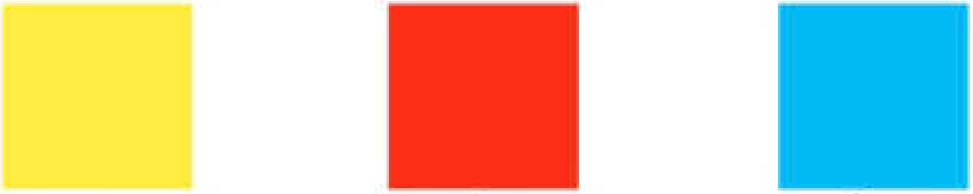

হলুদ　　লাল　　নীল

মাধ্যমিক রং

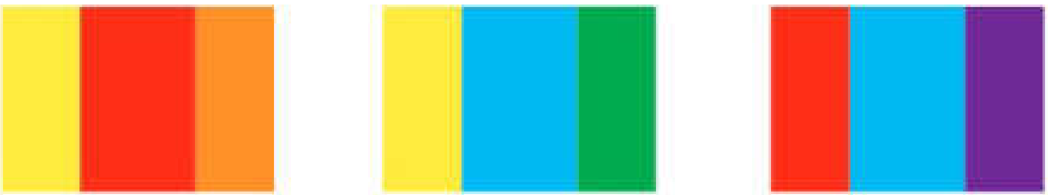

হলুদ+লাল = কমলা　　হলুদ+নীল = সবুজ　　লাল+নীল = বেগুনি

'উৎঘর' ১৯৮৮ সালে জলরঙে ছবিটি এঁকেছেন শিল্পী সঞ্জীব দাস অপু

জলরঙে নৌকা বাইচের ছবিটি এঁকেছে সাদিয়া মাহাবুবা, বয়স ১৩

একুশে ফেব্রুয়ারির ছবিটি প্যাস্টেল রঙে এঁকেছে বি, এম সা'দ আলভী, বয়স-১৩

'ঢেঁকিতে ধান ভানা' জলরঙে ছবিটি এঁকেছে নিশাত রাহনুমা, বয়স-১৩

জলরঙে বিদ্যালয়ের ছবিটি এঁকেছে- আফিয়া রাইসা, বয়স ১৩

জলরঙে ভাষা আন্দোলনের চিত্রটি এঁকেছে- রাহবার মাহমুদ, বয়স ১৩

পোস্টাররঙে ওপরের ছবিটি এঁকেছে- রাগিব, বয়স ১১

প্যাস্টেল রঙে গ্রীষ্মকালের ছবিটি এঁকেছেন মোঃ শাহরিয়ার হুসাইন (নাঈম), বয়স–১৪

শরৎকালে নদীর ঘাট, জলরং ও প্যাস্টেলে ছবিটি এঁকেছে অয়ন কলি মার্টিন গমেজ, বয়স-১৪

'নিজ প্রতিকৃতি' ১৯৬৩ সালে প্যাস্টেল রঙে শিল্পী হাশেম খানের আঁকা ছবি

সমাপ্ত

২০২৫ শিক্ষাবর্ষ

অষ্টম–চারু ও কারুকলা

ক্ষমা প্রদর্শন মহৎ গুণ।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য।